অতসী

দাম এক টাকা বারো আনা] [ভাদ্র, ১৩৩২

অতসী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বরদা এজেন্সী,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,
বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

কলিকাতা, [illegible] নং সার্পেন্টাইন লেন,
ক্যালকাটা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে,
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমতী রেণুকণা ও শৈলেনকে দিলাম

অতসী

--:০:--

ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা—

বানাজ্জি

জামাতা বাবাজীউ

বাজিকর

আলো-আঁধারী

আদরিণী ভাতৃরাণী এলো আমার ঘরকে—

ধ্বংসপথের যাত্রী এরা—

অতসী

—০—

পথের যাত্রী এরা—

...া লিখিয়াছিল, কালীঘাটের কাছাকাছি ট্রাম হইতে নামিয়া
...দি একটুখানি খোঁজাখুজি করিলেই তাহার বাসার সন্ধান
... অজিত তাহাই করিল। হাওড়া-ষ্টেশনে ট্রেন্ আসিয়া
...ল অতি প্রত্যুষে। সেখান হইতে বরাবর ট্রামে চড়িয়া
...র কাছে আসিয়াই নামিল। বর্ষাকালের সকাল। টিপি-
...ড়িতেছিল। দারুণ অভিমানে আকাশটা যেন ঘোমটা-
...মুখ গম্ভীর করিয়া আছে। অজিতের আস্‌বাব-পত্রের মধ্যে
...বরের কাগজে-মোড়া একটি ধুতি ও একখানি গামছা,

অপর হাতে রেলি-ব্রাদার্সের একটি ভাঙা তালি-দেওয়া ছাতা। পকেট হইতে রমেশ-দার চিঠিখানি বাহির করিয়া রাস্তার নাম ও বাড়ীর নম্বরটা আর-একবার সে পড়িয়া লইল। পথের উপর কাদা জমিয়াছে, তাহার উপর মোটরের উৎপাত।

কোনরকমে জামা কাপড় বাঁচাইয়া পথের একপাশ ধরিয়া সে চলিতে লাগিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করে, কেহ বলে, জানিনে; আবার কেহ বলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস্ করুন। অবশেষে একজন দয়া করিয়া বলিয়া দিল, এই রাস্তা ধরে' বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে একটা গলি, তারই একটু আগে, এইদিকে গিয়ে ওইদিকে বেঁকে সোজা চলে' যান।

বাঁ-দিকে, গলিটার ভিতর ঢুকিয়া এদিক্-ওদিক্ যে-দিকে যায়, গলির পর গলি আসিয়া তাহাকে যেন বারে-বারে পথ ভুলাইয়া দিতে থাকে। অনেক কষ্টে এই গলির গোলক-ধাঁধা হইতে বাহির হইয়া অজিত একটা ফাঁকা মাঠের উপর আসিয়া পড়িল। বৃষ্টি তখন ধরিয়া গেছে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, এই ফাঁকা আলো-বাতাসে আসিয়া যেন একটুখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মাঠের সুমুখে পচা পানায়-ভর্তি একটা ছোট পুকুর, তাহারই চারিপাশে অনেকখানা জায়গা জুড়িয়া খোলার বস্তি। তাহারই ও-পাশে কয়েকটা নারিকেল গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আবার সারি-সারি বাড়ী আরম্ভ হইয়াছে। বস্তির চতুঃসীমায় রাস্তার নাম বা নম্বরের কোনও বালাই ছিল না, খাপ্‌রার

ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা-

"ছোট-ছোট বাড়ীগুলার পাশ দিয়া কর্দমাক্ত সরু একটা পায়ে-চলার পথ সোজা চলিয়া গেছে।

পথটায় যেমন কাদা, তেম্‌নি দুর্গন্ধ। বাঁশের ছাতির বাঁটটা মাটিতে টিপিয়া টিপিয়া অজিত অতি সাবধানে সেই পথ দিয়া চলিতে-চলিতে হঠাৎ একটা বহু পুরাতন ইট-বাহির-করা ভাঙা বাড়ীর উঠানে গিয়া পথ হারাইয়া ফেলিল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি একটা দোতলা বাড়ী, সুমুখে কাঠের রেলিং-দেওয়া একটুখানি বারান্দা, তাও আবার রেলিং ভাঙ্গিয়া স্থানে-স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, —আবার কোথাও-বা আস্ত আছে; কুলি-ধাওড়ার মত উপর-নীচে সারি সারি অনেকগুলি অন্ধকার ঘর। সম্মুখে একটুখানি উঠান বাদ দিয়া তাহারই সম-সমান্তরালে ঘরের আর একটা সারি, চলিয়া গেছে, কিন্তু তাহার আর দোতলা নাই,—ওপারের ভাঙা বারান্দা হইতে এ-পারের ছাতে আসিবার জন্য মাঝে মাঝে সেতু প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উঠানের মাঝে দুইটা, জলের কল,— এ-ধারে একটা, আর ওই ও-ধারে একটা। কিন্তু কল দুইটার চারিদিকে হিন্দুস্থানী, খোট্টা, ভাটিয়া, উড়িয়া, বাঙ্গালী, নানাজাতীয় বিস্তর পুরুষ-রমণী, লোটা, টব, বাল্‌তি ইত্যাদি লইয়া আপন-আপন ভাষায় চেঁচামেচি করিয়া যেন হাট বসাইয়া দিয়াছে। অজিত একবার এদিক্-ওদিক্ বেশ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল,— কোথাও-বা স্যাক্‌রার ঠক্-ঠকানি সুরু হইয়াছে, কোথাও-বা

কামার-শালার হাপর চলিতেছে,—একটা লোক লালরঙের একটা লোহা সাঁড়াসী দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে, দুইদিক্ হইতে [illegible] তাহার উপর লোহার হাতুড়ি মারিয়া আগুনের ফিন্‌কি উড়াই[illegible] কোনও ঘরে বা ধোপার ইস্ত্রি চলিতেছে, আর তাহারই [illegible] দূরে একটা বন্ধ-ঘরের দরজার গায়ে ভাঙা টিনের উপর [illegible] দিয়া লেখা রহিয়াছে,—ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বুটজুতা, চটি জুতা, সুটকেস্ [illegible] —সুখনলাল রুইদাস। সুতরাং এই প্রকাণ্ড বাড়ীটা কোন[illegible] গৃহস্থের পর্দ্দাওয়ালা বাড়ী নয়, এবং তাহার এই অ[illegible] প্রবেশ লইয়া যে কোনপ্রকার হাঙ্গামা হইতে পারে না ভাবিয়া অজিত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু আ[illegible] প্রথম কলিকাতায় আসিয়া এখনও যে রমেশের উদ্দেশ [illegible] না, কোথায় গেলে যে মিলিবে,—মিলিবে কি মি[illegible] এই দুশ্চিন্তায় তাহার গায়ে যেন জ্বর আসিল। চ[illegible]লের সুবিধার জন্য জল-ছপ্‌-ছপে উঠানটার উপর সারি দি[illegible] ইট পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই একটা ভাঙা ইঁটের উপর অতিকষ্টে দুইটা পা রাখিয়া একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘটি হাতে করিয়া জল লইবার জন্য কলতলার জনতার এ পাশে উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। চেহারা অত্যন্ত কদাকার,—পেট্‌টা যেমন মোটা গলাটা আবার তেম্‌নি সরু, মাথার উপর প্রকাণ্ড একটা টাক, চোখ দুইটা নিতান্ত ছোট, নাকের নীচে বিড়ালের মত খাড়া

না, তাহার উপর মেঘ্‌লা আকাশে সূর্য্যের রশ্মিটুকুও ঢাকা পড়িয়াছে, কাজেই, ঘরের ভিতরটা বেশ ভাল করিয়া নজরে পড়িতে অজিতের একটুখানি দেরী হইল। দেখিল, সেই বায়ুলেশহীন অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে আরও তিনখানা 'সিট্' পড়িয়াছে। তাহার উপর, প্রত্যেকের ছোট-খাটো অনেকগুলি করিয়া আস্‌বাব, -মাটিতে যাহাদের জায়গা হয় নাই, তাহারা দেওয়ালে উঠিয়াছে, এমনি করিয়া ঘরের মেঝে এবং দেওয়ালে কোথাও এতটুকু তিল-ধারণের স্থান নাই। একটা মাদুরের উপর দাড়াইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া, একজন লোক ক্রমাগত ওঠ্‌-ব'স্ করিয়া বোধ করি ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছিল। একজন যুবক দেয়াল ঠেস্ দিয়া গুনগুন্ করিয়া গান করিতে-করিতে বিড়ি টানিতেছিল, আর একটা মাদুর খালি পড়িয়া ছিল।

রমেশের শয্যার একপার্শ্বে দেয়ালের গায়ে কোন্ এক মাসিক-পত্রিকা হইতে কাটা একটি বিবেকানন্দের, এবং একটি সিক্ত-বসনা নারীর, দুইখানি রঙীন ছবি পাশাপাশি টাঙ্গানো ছিল। জুতা ব্রুশ্ শেষ করিয়া রমেশ তাহার জুতা-জোড়াটি তাহারই নীচে দুইটি পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিল।

রমেশকে এমনভাবে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অজিত কেমন যেন একটুখানি বিব্রত হইয়াই ভাবিতেছিল, এখানে আসিয়া উঠা তাহার উচিত হয় নাই, চক্ষুলজ্জার খাতিরেই হয়ত রমেশ

তাহাকে আসিতে লিখিয়াছিল, সে যে সত্যসত্যই এখানে আসিয়া হাজির হইবে তাহা সে ভাবে নাই। অজিত বলিল, রমেশদা, তুমি ত আপিসে যাবে?

রমেশ এইবার মাদুরের উপর ভালো করিয়া চাপিয়া বসিয়া বলিল, হাঁ, আপিসে যাবো বই কি!—তাহার পর উপরের কড়িকাঠের দিকে একবার তাকাইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, [illegible] অজিত, কিন্তু—আচ্ছা, আপিসে-টাপিসে [illegible] দেখি সন্ধান করে'—পঁচিশ-ত্রিশ টাকার [illegible] একটা কিছু [illegible] যেতেও পারে। ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করলে কি হবে [illegible] চাকরীর বাজার দেখ্‌তে হবে ত? না, কি বলো হে প্রোফেসার?

সুরেশ মাদুরে বসিয়া যে ছোকরা বিড়ি টানিতেছিল উত্তরের আশায় রমেশ তাহার দিকে তাকাইল।

প্রোফেসারের বিড়ি টানা তখন শেষ হইয়াছিল, কিন্তু গান তখনও থামে নাই। প্রথম যেদিন সে এই ইম্পিরিয়াল হোষ্টেলে আসে, সেদিন সে এই বলিয়া পরিচয় দেয় যে, সে এম্-এ পাস করিয়া সম্প্রতি কোন্ একটা কলেজে প্রোফেসারি লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে—ভালো দেখিয়া একটা বাড়ী না পাওয়া পর্য্যন্ত এইখানেই থাকিবে। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহার সে চালাকি একদিন ধরা পড়িয়া গেল। সে সব অনেক কথা। তখন হইতে সকলেই

তাহাকে প্রোফেসার বলিয়া ডাকে, অন্যান্য বিষয়েও এখানে তাহার যথেষ্ট সুনাম আছে। প্রায়ই সে ইংরেজিতে কথা বলে, চাক্‌রীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু বাহিরের কায়দা-কানুন্ তাহার এম্‌নি লেফাফা-দুরস্ত,—দেখিলে বুঝিবার জো নাই যে, লোকটা বেকার।

রমেশের কথাটা সে ভালো শুনিতে পায় নাই, বলিল, I beg your pardon রমেশ বাবু, কি বল্‌ছিলেন ?

রমেশ বলিল, এই অজিত ছোক্‌রা ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করে' এল চাক্‌রীর সন্ধানে, তাই বল্‌ছিলুম, চাক্‌রীর বাজার

প্রোফেসার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর হাসি থামিলে অজিতের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, I graduated myself in the year of our Lord nineteen-twenty, but still not engaged.

এমন সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে বলিতে অজিতের পূর্ব্ব পরিচিত সেই কল্‌তলার ভদ্রলোক ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দরজার একপাশে যে মাদুরটা খালি পড়িয়া ছিল তাহারই একধারে জলভর্ত্তি ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া একসঙ্গে সকলকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিলেন, আর চলে না দেখ্‌ছি, —আমাদের জাত-ধর্ম্ম আর কিছু রইল না মশাই···

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, কি হ'ল ম্যানেজার বাবু ?

ম্যানেজার-বাবু সক্রোধে কহিলেন, হবে ? যা হবার, তাই

হ'ল। ওই ব্যাটা সুখন্‌লাল, না, আমার ইয়ে লাল! ব্যাটা মুচি, ব্যাটা চামার!···বল্‌লুম, ব্যাটা নিস্‌নে, নিস্‌নে, তোদের জন্যে রাস্তায় কল রয়েছে, সেই খান্ থেকে জল ধরে' আন্! তা না ব্যাটা হাঁ হাঁ কর্‌তে কর্‌তে নিলে একঘটি জল ধরে'। তাই নিবি ত নে, আল্‌গোছেই নে রে বাপু, তা না কলের বাঁশটাও ছুঁয়ে দিয়ে গেল।—এসব হচ্ছে পয়সার গরম। ছোট জাতের পয়সা হয়েছে কিনা···

যে লোকটি ব্যায়াম করিতেছিল, সে তাহার উঠাবসা বন্ধ করিয়া হাপাইতে হাপাইতে বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ! বলেন কি?

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা বাবা, আমিও দেখে' নিচ্ছি, কিছু করতে পারি কি না! আজই একটা 'মিটিং কল্' করি, তার পর হোষ্টেলের সবাই মিলে' একবার ভালো করে' বলা যাক্,—তা'তেও না শোনে, ব্যস্! প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ। সব বন্ধ করে' দেবো। বস্তির ওই উড়ে, খোট্টা, স্যাক্‌রা, কামার, ধোপা-টোপা সব বন্ধ। দেখি আমাদের কলে কে জল নিতে পারে,—কত বড় মরদ্‌কা বাচ্ছা,··· না, কি বলো হে পঞ্চানন?

অনেকক্ষণ হইতে কস্‌রৎ করিয়া পঞ্চানন বোধ করি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল: তাই সে একগ্লাস ঠাণ্ডা জলের সন্ধানে তাহার চটা উঠানো কলাই-করা টিনের গ্লাসটি হাতে লইয়া

পাশের ঘরে উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সেই গ্লাস-সুদ্ধ হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার এই এক্সারসাইজ্-করা হাতের একটি ঘুষির চোটে বাবাজীকে 'হালিম' খাইয়ে দিতে পারি, জানেন? আপনার ওই সুখন্‌লালকে দুখনলাল বানিয়ে ছেড়ে দেবো বাবা হেঁ-হুঁ!---এই বলিয়া সে তাহার উপরের এক পাটি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে বীরদর্পে চাপিয়া ধরিল।

শেষ পর্যান্ত তাই হবে। বলিয়া ম্যানেজার-বাবু দেয়ালের উপরের একটি কাঠের তাক্ হইতে ঔষধের শিশির মত কাগজের দাগ-কাটা একটি শিশি বাহির করিলেন।

প্রোফেসার বলিল, ওকি, আপনার oil-এর শিশি বেরুলো নাকি?

ম্যানেজার-বাবু কহিলেন, হাঁ। কি আর করি? আমায় ত আবার গঙ্গায় ছুটতে হবে কিনা! আপনাদের কি মশায়। মুচি, মোছলমান, যার ছোঁয়াই হোক্, হয়ত ওই চৌবাচ্চার জলেই চালিয়ে দেবেন,—এখানে আর কে দেখ্‌তে আসছে? কিন্তু প্রোফেসার, ভগবানের চোখ ত এড়াবার জো নেই। ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ---

প্রোফেসার নিজেও ব্রাহ্মণ। কাজেই এ প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, well ম্যানেজার-বাবু, একটা question আমি আপনাকে রোজ বল্‌ব বল্‌ব ভাবি,

but I forget altogether। আপনি যে ওই তেলের শিশিটায় কাগজের দাগ কেটে রেখেছেন, ও কিসের জন্মে ?

—সতর্কের বিনাশ নেই প্রোফেসার! খাঁটি সরষের তেল বাবা, আজকাল অগ্নিমূল্য,—তেরটি গণ্ডা পয়সা গাঁট থেকে খসাও, তবে একটি সের তেল পাবে। এই দেখুন,—বলিয়া ম্যানেজার-বাবু তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি শিশির গায়ের একটি দাগের নীচে চাপিয়া ধরিয়া অতিশয় সতর্কতাব সহিত তাঁহার বাম করতালুর উপর একদাগ তেল ঢালিয়া লইলেন এবং মাটিতে পড়িয়া যাইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সেই হাতটা একবার তাঁহার কেশবিরল মস্তকে এবং বার কয়েক তাঁহাব গম্বুজাকার উদরের উপর বলাইয়া লইয়া শিশির ছিপিটি অতি সাবধানে বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন, এইবার এই পূরোপূরি চারটি দাগ রইলো আমার গোণা। কই একবিন্দু এবার কেউ নিক্ দেখি ঢেলে, ভড়াক্ করে' ধরে' ফেল্‌ব। একটু বুঝে' সুঝে' চল্‌তে হয় প্রোফেসার, তা নইলে কি আর এই ইম্পিরিয়াল হোটেলখানা খুল্‌তে পারতুম ভায়া! চলি এবার। হরিবোল! হরিবোল!

গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া ম্যানেজার গঙ্গাস্নানে বাহির হইতেছিলেন, রমেশ বলিল, অজিতের নামটা খাতায় লিখে' দিয়ে গেলেন না? আজ সে এইখানে খাবে, ঠাকুরকে বলে' দিয়ে যান।

—ও হো, আপনার 'ফেরেণ্ড্' এসেছে যে! তা বেশ, বেশ। 'পার্‌মিনিট্' না 'টেম্‌পোরালি'?

রমেশ বলিল, যতদিন থাকে, দিনকতক থাবে এইখানেই।

—তেল মেখে' খাতাপত্র ছুঁতে ত পারিনে মশাই। আচ্ছা, গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে' এসেই,—নামটি কি বল্‌লেন?

—অজিতনাথ লাহিড়ী।

—আচ্ছা, আমি 'রেজেষ্টলি' করে' নেবো। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

স্নানাহারের পরেই ইম্পিরিয়াল হোটেল থালি করিয়া প্রায় সকলেই আপন-আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। রমেশ গেল, কুস্তিগীর গেল, এমন কি বেকার প্রোফেসারটিও একখানি কোঁচানো ধুতি পরিয়া, তাহার ইস্ত্রি-করা পরিষ্কার জামাখানি গায়ে দিয়া, গত সপ্তাহের একখানি ইংরাজি দৈনিক কাগজের তারিখের জায়গাটা অতিশয় দক্ষতার সহিত নীচের দিকে মুড়িয়া লইয়া বাহির হইল। ম্যানেজার-বাবুর আপিসের বালাই ছিল না। গঙ্গাস্নানের পর নীচের সেই অন্ধকার রান্নাঘরের কোণ ঘেঁসিয়া একটি পিঁড়ির উপর প্রায় ঘণ্টাখানেক উবু হইয়া বসিয়া-বসিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত তিনি যত পারিলেন আহার করিলেন, তাহার পর ঘটি ভরিয়া গঙ্গা হইতে যে জলটুকু আনিয়াছিলেন তাহাতেই আচমন শেষ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

গানের ভাবার্থ এই, যে, তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে, এইবার তিনি মাদুরের উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন, নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বেলা তিনটার সময়, কলে তখন জল আসিবে এবং ওই ব্যাটা মুচিকে তখন তিনি দেখিয়া লইবেন, মারের চোটে তাহার জল লওয়া আজ বাহির করিয়া দিবেন। এই কথাগুলিকে সে এক-বিষম অসমমাত্রিক গদ্যকবিতার ছন্দে তৎক্ষণাৎ মুখে-মুখে সাজাইয়া লইয়া তাহাতে যেরূপ সুর-সংযোগ করিয়া তিনি চেঁচাইতেছিলেন, তাহাকে যদি শ্রোতার কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার না বলিয়া সঙ্গীত বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ধোপা-বৌএর দোরে-বাঁধা ওই গর্দ্দভ-নন্দনের কণ্ঠটিকে শ্রুতি-মধুর এবং সুর-ব্রহ্ম না বলিয়া উপায় নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া অজিত ইতিপূর্ব্বেই রমেশের মাদুরের উপর আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

ম্যানেজার বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, আমার গান শুনে' মনে-মনে হাস্‌ছেন নাকি---ইয়ে বাবু?

শুধু হাসি নয়, তাঁহার এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত, অজিতের মনে করুণ এবং রুদ্র রসেরও উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল, তাই সে কি উত্তর দিবে কিছুই ঠাহর করিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইবামাত্র, তাহাকে সে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের কুণ্ঠা হইতে অব্যাহতি দিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিয়া উঠিলেন, বুঝ্‌ছেন না মশাই,

একসঙ্গে দুই কাজই হ'য়ে গেল। গান গাওয়াকে গান গাওয়াও হ'ল, আর ওই বেজাত ব্যাটা বিধর্মী চামারটাকে শুনিয়ে দেওয়াও হ'ল। সে কি আর বুঝতে পারেনি ভাবছেন? ঠি-ক্ টের পেয়েছে। টিন্ পিটোতে পিটোতে যে-রকম কট্‌মট্ করে' সে আমার মুখের পানে একখানা চাউনি হান্‌লে, ভাব্‌লুম, আসে বুঝি ব্যাটা হাতুড়ি নিয়েই তেড়ে!...সাধে কি আর তাড়াতাড়ি উপরে এসে গানখানা ধরে' দিলুম, মশাই? কই, আসুক্ ত দেখি এইখানে,—একবার মজা বুঝিয়ে দিই তা হ'লে। এ আমার নিজস্ব জুরিস্‌ডিক্‌সন্ (jurisdiction) বাবা,—দশটি বছরের লীজ্ (lease)। এই বলিয়া তিনি তাঁহার লালরঙের ময়লা-পড়া এবড়ো-খেবড়ো দাঁতের দুইটি পাটি বাহির করিয়া হাসিতে সুরু করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই চোয়াল বাহিয়া পানের কস্ গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু তাঁহার এই সারগর্ভ কথাগুলি বুঝিবার পক্ষে অজিত যে এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ; তাহার সেই অসাধারণ গম্ভীর মুখখানা দেখিয়াই সে-কথাটা বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না; কাজেই অরসিক এই নাবালকটার সহিত বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার মাদুরের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন এবং সযত্নরক্ষিত একটি ফাঁকা দিয়াশালাই-এর বাক্স হইতে কিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, ঘুমিয়ে-টুমিয়ে যাই ত যাবার সময় আমায় উঠিয়ে দিয়ে যেও।

—আমি এক্ষুণি চল্‌লাম। বলিয়া অজিত উঠিয়া তাহার জুতা জোড়াটি পায়ে দিতে লাগিল।

—আবার আস্‌ছ ত? রাত্রের খাবার—

—আজ্ঞে হাঁ, আসব। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বারান্দাটা পায়ের ভরে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। অতি সাবধানে বারান্দা পার হইয়া সিঁড়িতে নামিবার পূর্ব্বে অজিত একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই ম্যানেজার-বাবুর সহিত তাহার চোখো-চোখি হইয়া গেল; তিনি তখন দরজার চৌকাঠের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইতেছিলেন। নীচে মুখন্‌লাল মিস্ত্রির হাতুড়ি ও টিনের আওয়াজ তখনও থামে নাই এবং বোধ করি বা সেই কারণেই তিনি তাঁহার সেই জানালাহীন অন্ধকার ঘরের একমাত্র দরজাটিও তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতর হইতে সশব্দে খিল আঁটিয়া দিলেন।

পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া অজিতের যাইবার স্থান কোথাও ছিল না, তাই সে পথে ঘুরিবার সঙ্কল্প লইয়াই বাহির হইল। রৌদ্রের তেজে ছোট রাস্তার কাদা তখন কতক শুকাইয়াছে, কতক বা শুকায় নাই, আজিকার প্রভাতে যে বর্ষা নামিয়াছিল, বড় রাস্তাগুলা দেখিলে

অপরাহ্ণের দিকে চলিয়া পড়িতে লাগিল, —কখন আসিয়াছে, কত দূর হইতে আসিয়াছে তাহারা, কে জানে·····পেটগুলা তাহাদের খোলার মত ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, ক্ষুধার জ্বালায় নাড়ীতে নাড়ীতে পাক ধরিয়াছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলা রৌদ্রদগ্ধ কচি পাতার মত নেতাইয়া পড়িয়াছে, শুষ্ককণ্ঠে 'দাও' 'দাও' করিয়া হাকিয়া হাকিয়া এইবার ক্রমশঃই যেন তাহারা অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় খাবার আসিল। এক-একটা শালপাতার ঠোঙায় লুচি সন্দেশ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সঙ্গে একটি করিয়া আম এবং একটি করিয়া দোয়ানি, বাহির হইবার সময় প্রত্যেকের হাতে-হাতে দেওয়া হইবে। ভিতরে ঢুকিবার দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইবার জন্য পাশের আর-একটা দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। তৎক্ষণাৎ একটা সাড়া জাগিয়া গেল,—মুহূর্তমধ্যে ক্ষুধিত জনসঙ্ঘ একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ হুমড়ি খাইয়া একেবারে দরজার নিকট আসিয়া পড়িতে লাগিল। খাবারগুলি কেহ-বা আঁচলের তলায়, কেহ বা দুই হস্তের দৃঢ়মুষ্টিতে যখের ধনের মত অতিশয় সযত্নে চাপিয়া ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়াও ফুটপাথ এবং রাস্তার উপর তাহাদের ভিড় জমিয়াছিল। অনেকেই তাহাদের পথের সাথীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, অনেকেই আবার পুনঃপ্রবেশের পথ খুঁজিতে আরম্ভ করিল, এবং কেহ

অতসী

আমটা পচা, কোন্‌টা কাঁচা, কাহার বড়, কাহার ছোট,—এই লইয়া বুড়োবুড়ী হইতে ছেলেমেয়ে পর্য্যন্ত চেঁচামেচি করিতে লাগিল। এই সুযোগে কে-একটা লোক একটি ছোট মেয়ের হাত হইতে তাহার খাবারের ঠোঙাটা ফস্ করিয়া তুলিয়া লইয়া ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল। মেয়েটা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া পড়িতেই, পশ্চাৎ হইতে আর-একটা জনস্রোত হু হু করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল। এই দুই দলের মাঝখানে চাপা পড়িয়া মেয়েটা এম্‌নিভাবে তলাইয়া গেল যে, বেচারা একেবারে মারা পড়িবার জো হইল। অজিত আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, জামার আস্তিন গুটাইয়া ভিড় ঠেলিয়া সেও ঢুকিয়া পড়িল এবং মিনিট দুই তিন পরে টানা-হেঁচ্‌ড়া করিয়া মেয়েটাকে যখন বাহির করিয়া আনিল, তখন সে তাহার একহাতে দো-আনিটি এবং অন্য হাতে আমটি তাহার বুকের কাছে দাঁতে দাঁত দিয়া কিট্‌কিট্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতেছে,—আমের আঁটি ও খোসাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, এত লোকের চাপাচাপিতে চাপ্‌টা হইয়া রসটুকু তাহার অঙ্গ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে।

রাস্তার জনতা হইতে কুড়ি বাইশ বছরের একটি গৌরবর্ণ ক্ষীণা মেয়ে 'অতসী' 'অতসী' বলিয়া পাগলিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। মেয়েটা এত দুর্ব্বল যে, এইটুকু তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়াই সে একেবারে হাঁপাইয়া পড়িল। ছিন্ন একখানা মলিন

ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা—

বুকের গায়ের পাঁজরাগুলা সে কোনরকমে ঢাকা দিয়াছে, চোখ দুইটা ডাগর, নাকটা খাঁড়ার মত উঁচু, গালদুইটা তোবড়া, মুখে দু-একটা বসন্তের দাগ, সিঁথিতে সিঁদুর। দারিদ্র্য ও রোগ যেন তার যৌবনের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিয়া তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়াছে, -রৌদ্র দগ্ধ অর্দ্ধপক্ক ফলের মত শুষ্ক বৃন্তের ডগায় ঝুলিয়া, সে যেন খাই-খাই করিতেছে, আর একটা ঝড়ের ঝাপ্টা দিলেই টুপ করিয়া খসিয়া পড়িবে!......

অতসী তাহার মাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া অজিত বলিল, লোকজনের চাপে পড়ে', গিয়েছিল এখনি--

--বললাম আমার সঙ্গে আয়, তা না দুষ্টু, দেবে -- বলিয়াই ক্রন্দনরত অতসীর পিঠের উপর মেয়েটি কসিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, চড় খাইয়া অতসী যত না আহত হইল, মেয়েটির রোগ-শীর্ণ দুর্ব্বল হাতটাতেই তার চেয়ে লাগিল বেশী।

মেয়েটি বলিল, কেমন? খাবার টাবার সব নিয়েছে ত কেড়ে? বেশ করেছে। আয়। বলিয়া সে অতসীর একখানা হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে ফুট্‌পাত হইতে তাহাকে পথের উপর নামাইয়া দিল। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে মেয়েটি অজিতের মুখের পানে একবার তাকাইল, কিন্তু সেই একটি সকরুণ চোখের চাহনির মধ্য দিয়া মানুষ যে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা এমন সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করিতে পারে,

ইতিপূর্ব্বে অজিতের তাহা জানা ছিল না। অতসীর কাঁধের উপর একটি হাত রাখিয়া মেয়েটি অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।

গাছের শাখায় কাকের কোলাহল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। খাবার গন্ধ পাইয়া ন্যাংলা কুকুরগুলা তখন পার্কের আশে-পাশে এবং 'ড্রাই্ বিনের' ধারে-ধারে জিভ বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল… বাসায় ফিরিবার জন্য অজিত হাটিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় ঠিক তার চোখের সুমুখে একজন অন্ধের হাত হইতে তার খাবারের ঠোঙাটা একটা চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। অন্ধ বোধ করি পাগল ছিল। যে ছোঁড়াটা তাহার বাঁ হাতের লাঠি ধরিয়া তাহাকে পথ দেখাইতেছিল, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া লাঠিটা তাহার সুমুখের অন্ধকারে সে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল, রাগে কি যেন বলিতেও গেল, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড চিলটার তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে অন্ধ ভিক্ষুকের ডানহাতটা তখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেছে—সহসা তাহারই যন্ত্রণা অনুভূত হইতেই তার দৃষ্টিহীন সেই সাদা চোখ দুটা দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, হাত-পা ছুঁড়িয়া রুদ্ধ-অভিমানে সে তার চুলগুলা হাত দিয়া টানিতে টানিতে চীৎকার করিয়া উঠিল, ত্রাণ ভাই, ত্রাণ্ মানিক………উঃ! বাবা রে—

কিন্তু তার হাতের ক্ষতে যে খুন্ ঝরিতেছিল, অন্ধের চোখে তা ধরা পড়িল না,—দেখিলে বোধ করি সে শিহরিয়া থামিয়া যাইত…

ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা—

সোজা পথ ভুলিয়া বাঁকাপথে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া অজিত যখন বাসায় ফিরিল, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেই প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ীটার ফটকের পাশে করপোরেশনের একটা গ্যাসবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার তলায় শুইয়া একটা ষাঁড় ঘন ঘন কান নাড়িয়া জাবর কাটিতেছে, আর তাহার সেই বিরাট বপুর আড়ালে বসিয়া, আবার কেহ বা তাহার গায়ের উপরে আরামে ঠেস্ দিয়া, কয়েকটা ছোকরা তাস পিটাইয়া বোধ করি জুয়া খেলিতেছিল। ধীরে ধীরে তাহাদের পাশ কাটিয়া অজিত ভিতরে প্রবেশ করিল। আধো আলো, আধো অন্ধকার উঠানের একপাশে গোপা বৌএর ঘরের ভিতরে তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রীতে কাপড় ইস্ত্রি করিতেছিল, এদিকের একটা ঘরে উড়িয়াদের তখন 'রামলীলার' 'রিহার্স্যাল' চলিতেছে,—স্যাকরা কয়েকজন হাতুড়ি ঠুক্ ঠুক করিয়া গহনা গড়িতেছে, কামার-শালাটা বন্ধ, কিন্তু তাহার পাশের ঘরে সুখনলাল মিস্ত্রী একটা মাটির প্রদীপের সুমুখে বসিয়া চোখে চশমা দিয়া চামড়ার 'সুট্‌কেস' তৈরী করিতেছিল।

ভাঙা সিঁড়ির একটা ভাঙা ইটের উপরে কেরোসিনের যে ডিবেটা আলোর চেয়ে ধূম উদ্গিরণ করিতেছিল বেশী,—তাহারই সেই ঝাপ্‌সা অন্ধকারে পথ দেখিয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে অজিত তাহার রমেশ-দার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বস্তির ইতর লোকগুলাকে এবং বিশেষ করিয়া সুখনলাল মিস্ত্রীকে জব্দ করিবার

নাটং তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, কিন্তু গোলমাল তখনও থামে নাই। অজিতকে সে-সম্বন্ধে কেহ কোনও কথা না বলিলেও প্রোফেসার ও ম্যানেজারের যুক্তিপূর্ণ বাদানুবাদ এবং সেই কুস্তিগীর ভদ্রলোকের আস্ফালন শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, আগামী কল্য প্রাতে বস্তির মেয়েগুলাকে এবং কামার, স্যাক্‌রা, উড়ে, ও সেই মুচি বেটাকে কলে জল লইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইবে, যদি তাহাতেও না শোনে,—কাল শনিবার, সকলেই সকাল-সকাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিবে, এবং বৈকালে তাহারা পুনবায় যখন জল ধরিবে, প্রোফেসার নিজে অগ্রণী হইয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সহিত অনর্থক একটা ঝগড়া বাধাইয়া দিবে, তাহার পর সেই ঝগড়ার সূত্র ধরিয়া কুস্তিগীর-মহাশয়, তাহাদের পালের-ধাড়ি ওই মুচি ব্যাটাকেই বেশ করিয়া ঘা-কতক বসাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে এই ইতরের ছোঁয়া জল ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের সনাতন জাতি-ধর্ম্ম নাশের আর কোনও আশঙ্কা রহিবে না।

অজিতকে কাছে ডাকিয়া রমেশ বলিল, ওরে অজিত, শোন্, কাল ত আর হবে না, পরশু রবিবার, আমার সঙ্গে হরিশ মুখুজ্যের রোডে একবার চল দেখি,—একজন উকিল আজ আমায় বলেছেন, কতকগুলো দলিল তার ওখানে বসে' বসে' কপি করে' দিয়ে আসবি,

দুটো টাকা দেবে। বুঝ্‌লি? টাকা-দুটো ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে দিস্, নইলে তোর খাবার চার্জ্জ্‌টা······সঙ্গে কিছু এনেছিস্? না সেদিকে অষ্টরম্ভা—

অজিত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, না রমেশ-দা, আস্‌বার সময় মার কাছে কিছু পেলাম না।

তবে এলি কেন বাপু! বলিয়া রমেশ মুখ ফিরাইয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল।

ম্যানেজার-বাবু বলিতেছিলেন, তুই ছোটজাত, এতগুলা বামুন রয়েছে মাথার উপরে, তাদের সঙ্গে ধর্‌তে গেলে এক-রকম বাসই কর্‌ছিস্ তুই,—তোর যে বাহান্ন পুরুষ নরক থেকে উদ্ধার হ'যে গেল, তার ঠিক আছে?

প্রোফেসার বলিল, certainly।

একবার প্রোফেসারের দিকে মুখ ফিরাইয়া ম্যানেজার কহিলেন, হ্যাঁ ব্যাটা কোনদিন একজোড়া পাঁচসিকের চটিজুতো দিয়েও বলেছে হ্যাঁ,—যে, নিয়ে যাও ঠাকুর, ছ-মাস পায়ে দিয়ে দেখো। ছোট-লোকের পয়সা-টয়সা না-হওয়াই ভালো, বুঝ্‌লে প্রোফেসার, তল-মাথা সমান কর্‌তে চায়। ওই যে কথায় আছে, বাঁদরের চুল হ'লে বাঁধ্‌তে জানে না।

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ! পয়সা না ছাই করেছে! Money এত cheap নয় ম্যানেজার-বাবু, ওসব বুঝ্‌ছেন ত,

illiterate uneducated class কিনা! বিনয় জানে না, ভদ্রতা জানে না—disobedient, rogue!

কুস্তিগীর লাফাইয়া উঠিল, সব সিধা বানিয়ে দেবো, প্রোফেসার। কাল তুমি ঝগড়ার 'উট্‌টুংটা' একবার তুলে' দিও, বাস্‌,—তার পর আমি দেখে' নেবো। মারের কাছে বাবা সব জব্দ। আমার এই ডান-হাতের একখানা ঘুষি—বাস্‌……এই বলিয়া সে তাহার দক্ষিণ হস্তটি সকলের সম্মুখে একবার প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দিল।

—এই ত! আর কি চাই! মরদকা বাত আর হাতীকা দাঁত! বলিয়া ম্যানেজার তাহার সে অপরিষ্কার দন্তপাটি বিকশিত করিয়া পেট নাচাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বাহিরের অন্ধকারের দিকে অজিত একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। নীচে 'রামলীলা'র 'রিহারস্যাল' তখন বন্ধ হইয়াছে। শাকরার হাতুড়ির সঙ্গে-সঙ্গে সুমুখে খোলার বস্তির একটা ঘর হইতে একটানা একটা কাশির শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। লোকটা হয়ত যক্ষ্মার রোগী,—কাশিতে কাশিতে শ্বাস তলাইয়া গিয়া মাঝে মাঝে যেন তার দম আট্‌কাইবার উপক্রম হইতেছে।

পরদিন সকালে উঠানের কলে যাহারা জল লইতে আসিল, ম্যানেজার, প্রোফেসার, পঞ্চানন, ইত্যাদি সকলেই তাহাদের

নিষেধ করিল বটে, কিন্তু প্রাণ-ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক এই পানীয়ের জন্য যাহারা আসিয়াছে, সামান্য দু'টা মুখের কথায় তাহাদের এত বড় প্রয়োজনের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া বড় সহজ নয়,—অক্ষম এবং নিরুপায় যাহারা, সক্ষমের দুয়ারে একটুখানি করুণার দাবি যে তাহাদের আছে, বোধ করি এই সহজ এবং সত্য কথাটা তাহারা জানিত বলিয়াই হটিয়া গেল না।

এদিকে ম্যানেজারের খোঁচানির চোটে এবং তাহাদের আদেশ অমান্যের ঔদ্ধত্যে প্রোফেসারের ঝোঁক, পর্দ্দায়-পর্দ্দায় চড়িতে আরম্ভ করিল। শান্তশিষ্ট এই অকেজো বাংলা ভাষাটা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে সে জোরালো হিন্দুস্থানী, পরে রোখালো ইংরেজী ভাষা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন গত রাত্রের ব্যবস্থাটা প্রয়োগ করাই যে এখানে যুক্তিসঙ্গত, এবং বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া যে তাহাই করিতে হইবে, এই লইয়া অদূরে দণ্ডায়মান পঞ্চানন-কুস্তিগীরের সঙ্গে সকলেরই একবার চোখ-টেপাটিপি হইয়া গেল।

আহারাদির পর সকলে আপিস চলিয়া গেলে, ম্যানেজার বাবু গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। সকলের ছোঁয়া সেই চৌবাচ্চার জলেই অজিত স্নান করিয়াছিল,—এই অবসরে আহারের নিমিত্ত সে নীচের রান্নাঘরে নামিয়া আসিল। ঘরটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে

সাত-আট হাতের বেশী নয়; মেঝেটা ছাড়া কড়িকাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের চৌকাঠ পর্য্যন্ত আগাগোড়া কালী ও ঝুলের একটা পুরু আস্তরণ পড়িয়াছে,—দেওয়ালের একধারে উনানের উপর একটা টিন চড়াইয়া হোষ্টেলের নাক্‌কাটা খোঁড়া ঝি, তার ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিতেছিল, তাহারই পায়ের কাছে ভাত, ডাল, তরকারীর উপর মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে। অজিত দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর কয়েকটা এঁটো থালা পড়িয়া ছিল। ঝি তাড়াতাড়ি খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বাসন কয়টা তুলিয়া লইয়া নোংরা দুর্গন্ধপূর্ণ নাতাটা মেঝের উপর একপোচ বুলাইয়া দিয়া নাকিস্বুরে ডাকিল, ঠাকুঁর! অ ঠাকুঁর! বাবুকে ভাঁত দিয়ে যাঁও—

কোনও একটা বিশেষ স্থান হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া ঘটিটা কলতলায় নামাইয়া রাখিয়া পাচক-ব্রাহ্মণ অজিতের ভাত বাড়িতে বসিল। কোমরে-জড়ানো কালো রঙের যজ্ঞোপবীতটা না দেখিলে কাহার সাধ্য তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া চেনে।

অজিত খাইতে বসিয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরে উনানের নিকট হইতে ঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, ধঁর্‌ তঁ রেঁ বঁজ্জাত মেয়েঁকে! আঁসছে মানিজাঁর-বাঁবুঁ। বেঁরো বঁলছি—

ভাতের গ্রাসটা মুখে দিতে যাইবে, এমন সময় এই অস্বাভাবিক

কণ্ঠস্বরে অজিত চমকিয়া শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া বলিল, অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি, কি, কি বল্‌ছ ঝি?

ওই দেখুন না বাবু। বলিয়া বস্তির দিকের খোলা জানালাটার দিকে ঝি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার বলিল, সকালে ভাতের ফেন ধ'রে' নে গেছে এক হাঁড়ি,—আবার এয়েছে ভাত চাইতে—

অজিত তাকাইয়া দেখিল, জানালার বাহিরে নর্দ্দমাটার পাশে মাটির একটি মাল্‌সা হাতে লইয়া একটি মেয়ে অত্যন্ত সকরুণ-নয়নে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে। অজিত দেখিবামাত্র চিনিল, এ সেই অতসী,—গতকল্য কাঙ্গালী ভোজন দেখিতে গিয়া যাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। সে চিনিল বটে, কিন্তু মেয়েটা চিনিতে পারিল কি না, কে জানে! অজিত জিজ্ঞাসা করিল, তোরা এইখানে থাকিস্ নাকি?

হ্যাঁ, ওই বস্তিতে। বলিয়া পশ্চাতে খোলার ও গোলপাতার ঘরগুলার দিকে সে একবার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, তাহার পর, মাটির মাল্‌সাটা দুইহাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ও মিছেকথা বল্‌ছে বাবু, এই নর্দ্দমা থেকে এই মাল্‌সার আধ মাল্‌সা ফেন ধরে' নিয়ে গেছি। এই দেখ বাবু, এই এতটুকুন — বলিয়া অতসী মাল্‌সাটার ভিতরে আঙুল দিয়া কতটুকু ফেন সে ধরিয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, কেন্ কি করেছিস্?

—খেয়েছি বাবু, আমি অর্দ্ধেকটা, মা অর্দ্ধেকটা। দাও না বাবু ওকে বলে'—এঁটো ভাত-চারটি দিক এতে। আমার মা কাল থেকে কিছু খায়নি।

কেন, কাল যে সেই লুচি পেয়েছিলি?

—ও মা? সে ত' তিনটি! আমি দুটি খেলাম, আর মা একটি খেলে।

—তোর মা কোথা?

-ওই যে! বলিয়া বস্তির পাশে যে খালি জায়গাটা পড়িয়াছিল, মেয়েটা সেইদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

অজিত তাকাইয়া দেখিল, কিন্তু কয়েকটা ঘেঁটু ও বনকচুর গাছ ছাড়া সেখান হইতে কিছুই তাহার নজরে পড়িল না।

ঝি বলিয়া উঠিল, তুমি খাও না বাবু, ওর সঙ্গে কি হচ্ছে তোমার? -দাড়াও, আবাগীর বেটি কেমন করে' না নড়ে তাই দেখাচ্ছি আমি। এই বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা কাঁসার বাটি দিয়া উনানের-উপর বসানো টিন হইতে খানিকটা ফুটন্ত গরম জল তুলিয়া লইয়া, জানালার পথে সেই মেয়েটার গায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

খানিকটা গরম জল অতসীর গায়ে লাগিতেই, ও মা গো! বলিয়া যন্ত্রণায় সে একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু কাঁদিল না

পলাইয়াও গেল না, বরং সেইখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, খোনা, নেংচী মাগী কোথাকার! তুই কোন্‌দিন দিস্? তোকে আমি বল্‌ছি? তবে যে হাতটা আমার পুড়িয়ে দিলি?

অজিতের আর খাওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার পাতের এই ভাতগুলো ওকে দিয়ে দাও ঝি।

অত্যন্ত আগ্রহে অতসী তাহার হাতের মালসাটা দুই হাত দিয়া জানালার গায়ে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,-ওগো বাবু গো, তুমি নিজে দিয়ে যাও বাবু, ও দেবে না বাবু, তোমার পায়ে পড়ি বাবু গো—

অজিত ফিরিয়া দাড়াইয়া মুঠা মুঠা করিয়া জানালা গলাইয়া সমস্ত ভাত তরকারী তাহার পাত্রের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত দিবে না ভাবিয়া মেয়েটা আপনমনেই রুদ্ধশ্বাসে বলিতে আরম্ভ করিল, হেঁ, হেঁ, আরও, আরও, আর-চারিটি, ওই তরকারীটা, ওই মাছের কাঁটাটা বাবু,—আমার মা, আমার মা আছে বাবু, আমরা দু'জনা……

পশ্চাৎ হইতে ঝি বলিয়া উঠিল, দেখো বাবু,—ভাতফাত ছিট্‌কিয়ে না ইদিকে এসে পড়ে, মানিজার-বাবু কিছু বাকি রাখ্‌বে না তাহেলে—

তাহার সেই সানুনাসিক কণ্ঠস্বরে অজিত এবার

আর চমকিয়া উঠিল না,--সেদিকে তখন তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

* * * *

বৈকালের আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত ছিল,--ছোক্‌রাদের মাত্র আপিস হইতে ফিরিবার অপেক্ষা। সেদিন শনিবার; কাজেই ফিরিয়াও আসিল, কলে জল আসিবার ঠিক পরেই। সেদিন তাঁহার দিবানিদ্রাকে একটুখানি বিশ্রাম দিয়া ম্যানেজার-বাবু একবার বারান্দায় আসিয়া একবাব ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে দেখিতে-দেখিতে জল লইবার জন্য পঙ্গপালের মত পুরুষ-রমণীতে কল তলাটা ছাইয়া গেল। সুখন্‌লালেরও জলের প্রয়োজন। সে তখন তাহার নিজ-হাতের-তৈরী টিনের বাল্‌তিটি হাতে লইয়া জনতার একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। পায়ের তলার জুতা যাহারা তৈরী করে, তাহার চেয়ে ছোটজাত আর নাই, কাজেই ব্রাহ্মণের জাতি ধর্ম্ম রক্ষার পক্ষে সে-ই বোধ করি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। ম্যানেজার-বাবুর আক্রোশ তাই তাহারই উপর একটুখানি বেশী। অবশ্য বিনা-পয়সায় তাঁহার মত ব্রাহ্মণের পায়ে, বৎসরে অন্ততঃ একজোড়া করিয়া পাঁচসিকার চটিজুতা যে সে প্রাণান্তেও দিতে চায় না,- এ-কথাটা অবশ্য আপনাদের শুনাইয়া দেওয়া ভাল হইল

না,—তবে ইহাও যে ইম্পিরিয়াল হোষ্টেলের ম্যানেজার-বাবুর 'জাতক্রোধের একটা অঙ্গীভূত কারণ, তাহাও সত্য'।

শত্রুর বিরুদ্ধে কুকুরকে যেমন করিয়া হাততালি দিয়া লেলাইয়া দেওয়া হয়, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রোফেসারকে তিনি ঠিক্ তেম্‌নি ভাবেই ক্ষেপাইয়া দিলেন। পঞ্চানন-কুস্তিগীরের উপরেই যজ্ঞের দক্ষিণার ভার, সেও বার কতক গা মুড়িয়া কোঁচা-কাছা বেশ করিয়া সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রোফেসারের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। রমেশ-দাদাটিও কম নন। একটা বড় ঘটি হাতে লইয়া ঠিক সেই সময়েই তাঁহার জলের প্রয়োজন হইল। ম্যানেজার-বাবু ছারপোকার মতই চতুর, সামান্তে ধরা-ছোঁয়া দিতে নারাজ,—কাজেই তিনি উপরের বারান্দা হইতেই খুব জোর গলায় মুখ-খিস্তি করিতে লাগিলেন।

ইংরাজীতে লেক্‌চার দেওয়ার চেয়ে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া নিরপরাধীর গায়ে আঘাত করা যে কত কঠিন, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্র প্রোফেসার তাহা টের পাইল।

দেশে একদিন জোর করিয়া একজন চাসার জমি দখল করিতে গিয়া পঞ্চানন মার খাইয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল, তখন হইতে সেই চাষাকে মারিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া অবধি পঞ্চানন ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তির উদ্বোধন তাহার যে কতখানি হইল, মাঝে-মাঝে সেটা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তাহার বড় বেশী প্রবল হইয়া উঠিত। কিন্তু ওই গাব্‌দা

মুচি বেটাকেই যা ভয়। তা হউক্, সেরূপ কিছু সম্ভাবনা দেখিয়া সুমুখে রান্নাঘরটা খোলা আছে, তাহা সে পূর্ব্বাহ্ণে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল!

মেয়েগুলার সহিত দু-একটা বাক্-বিতণ্ডা হইবার পরেই উপর হইতে ম্যানেজার-বাবু বলিয়া উঠিলেন, বল্‌লে কথা শোনে না,. দাও ত ভায়া পঞ্চানন ওদের ঘা-কতক দিয়ে ওখান থেকে তাড়িয়ে,—আর ওই সঙ্গে—ব্যাটাকেও।

সুখন্‌লালের নামটা উচ্চারণ না করিয়া কৌশলে ইসারা করিয়া তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিলেন।

পঞ্চানন আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া হুড়্ মুড়্ করিয়া সে মেয়েগুলার গায়ের উপর গিয়া পড়িল এবং "ভাগ্ যাও! ভাগ্ যাও! জল নাহি দেগা!" বলিতে বলিতে কাহারও টব উল্টাইয়া দিয়া, কাহারও ঘটি-বাল্‌তিতে লাথি মারিয়া, দু-একটা মেয়েকে এলোপাথাড়ি এদিক্-ওদিক্ ঠেলিয়া দিয়া একটা বিষম হট্টগোল বাধাইয়া দিল।

করেন কি, করেন কি, বলিয়া বাল্‌তিটা হাত হইতে নামাইয়া সুখন্‌লাল তাহাকে যখন নিবৃত্ত করিতে ছুটিয়া আসিল, মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ম্ম সমাধা করিয়া দিয়া বিজয়ী বীরের মত পঞ্চানন তখন রাগের মাথায় হাঁপাইতে-হাঁপাইতে এবং কাঁপিতে-কাঁপিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে।

ঠিক করেছেন, আচ্ছা করেছেন মাগীদের। বলিয়া আশে-পাশে কয়েকটা লোক ঘরের ভিতর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া হাসাহাসি করিতেছিল।

কিন্তু মেয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে দেখিতে পাওয়া গেল, একটা শীর্ণকায়া দুর্ব্বল মেয়ের গায়েই পঞ্চাননের শক্তি পরীক্ষার মাত্রা একটুখানি বেশী হইয়া গেছে। চৌবাচ্চার পাশে নর্দ্দমাটার উপর হুমড়ি খাইয়া মেয়েটি এমনভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছে যে, কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টায় সেখান হইতে উঠিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

সুখনলাল কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দিবার জন্য একবার ছুটিয়াও গেল, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে, তাহাকে স্পর্শ করিলে হয়ত ওই একমাথা চুল লইয়া এই অবেলায় তাহাকে স্নান করিতে হইবে, এই ভাবিয়া সে তাহার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাটাকে অতিকষ্টে অতিদুঃখে দমন করিয়া নিতান্ত অসহায়ভাবে ইহার-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। এমন সময় অজিত উপর হইতে ছুটিয়া গিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল, কিন্তু মুখের পানে তাকাইতেই তাহার হাতটা কেমন যেন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দেখিল, সে অতসীর মা। ভাঙা ইটের গায়ে লাগিয়া তাহার হাতের কনুই, হাঁটু এবং মুখের যেখানে-সেখানে ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে, ছেঁড়া কাপড়খানাও

স্থানে-স্থানে ছিঁড়িয়া গেছে। মেয়েটা সংজ্ঞা হারায় নাই, কাজেই উঠিযাই সর্ব্বপ্রথমে সে অত্যন্ত লজ্জিত এবং সঙ্কুচিত হইয়া তাহার ছিন্ন বস্ত্রটাকে কম্পিত হস্তে টানিয়া-টানিয়া আরও ভাল করিয়া ছিঁড়িবার ব্যবস্থা করিতেছিল, এমন সময় বস্তির ভিতর হইতে 'মা' 'মা' বলিয়া অতসী ছুটিয়া আসিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া একবার অজিতের দিকে একবার তাহার মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

নিজেই একবার হাঁটিবার চেষ্টা করিতে গিয়া অতসীর মা টলিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, অজিত সাবধানে তাহার একখানা হাতের উপর ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চলো।

ভোবড়া বাল্‌তিটা হাতে লইয়া অতসী আগে-আগে চলিতে লাগিল।

বস্তির মাঝখানে সবচেয়ে ছোট একটা খোলার ঘরের মধ্যে পথ দেখাইয়া অতসী তাহাদের লইয়া গেল। বাঁকারি-দেওয়া দেওয়ালের গায়ে মাটি লেপিয়া দেওয়া হইযাছে, চারিদিকে কোথাও আলো-বাতাসের পথ না থাকিলেও মাথার উপরে কয়েকটা ভাঙা খাপ্‌রার ছিদ্রপথে ঘরের ভিতর যথেষ্ট আলো প্রবেশ করিতেছিল। স্যাঁৎসেঁতে মেঝের এককোণে ছেঁড়া একটা চাটাই-এর উপর চট্ ও ছেঁড়া কাঁথার যে শয্যাটা বিছানো ছিল, অতসীর মা নিজেই ধীরে ধীরে তাহার উপরে গিয়া শয়ন করিল। ঘরের একধারে

কয়েকটা হাঁড়ি ও মাল্সা সারি-সারি সাজানো রহিয়াছে, তাহার পাশেই মাটির একটা উনান এবং প্রয়োজন হয় না বলিয়াই রন্ধনের কয়েকটি অতি সামান্য সরঞ্জাম তাহার ঠিক মাথার উপরেই একটা দড়ির শিকায় ঝুলিতেছে। সুমুখের দেওয়ালের গায়ে 'বাঙ্গালীপল্টন' এবং 'সমর ঋণের' একটা বৃহদাকার ছেঁড়া ছবি আঠা দিয়া জন্মের মত আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের অপ্রশস্ত চালার উপর একটা বড় গাই বাঁধা ছিল। কাদা ও গোবরের উপর অসংখ্য মশা ও মাছি;—দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, ও গাইটা কার?

অতসীর মা অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, ধোপাদের। ওরাই এ ঘরের ভাড়া দেয়।

অজিত আবার বলিল, খুব বেশী লেগেছে? যন্ত্রণা—

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অজিত কিয়ৎক্ষণ থামিয়া এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া কহিল, তোমার স্বা—অতসীর বাবা কোথায়?

অত্যন্ত ম্লান একটা দুঃখের হাসি হাসিয়া অতসীর মা পাশ ফিরিয়া শুইল। কোন উত্তর দিল না।

অতসী বলিয়া উঠিল, ভোই কল্কাতার সেই নেবুতলায় আছে বাবু। কালীঘাটের জুনিয়ার সাথে আমি একদিন গেছ্লাম। মেরে'

তাড়িয়ে দেছ্‌লে বাবু। আর একদিন যাবো, নয় মা? বলিয়া সে তাহার মায়ের শিয়রের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল।

অজিত আর কোনও প্রশ্ন করিল না। নিতান্ত অসহায়া এই দুই মাতাপুত্রীকে প্রশ্ন করিবার মত আর-কিছু ছিলও না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। ভাবিল, দলিল নকল করিয়া কাল যদি সে দুইটা টাকা পায়, তাহা হইলে একটা টাকা সে ইহাদের দিয়া যাইবে।

ইম্পিরিয়াল হোটেলে তখন বোধ করি তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। অজিত ঘরের চৌকাঠ মাড়াইতে না মাড়াইতে ম্যানেজার-বাবু বলিয়া উঠিলেন, হাঁ-হাঁ-হাঁ হাঁ বাইরেই দাড়ান, বাইরেই দাড়ান, ঘরে ঢুক্‌বেন না মশাই, এটা আপনার হোটেল-খানা নয়, এর একটা রীতিমত 'প্যাল্‌টিচ্‌' আছে। দিন্‌ না রমেশ-বাবু, ওঁর গামছা কাপড়টা ছুড়ে'। যান্‌ গঙ্গাচ্চান্‌ করে' আসুন,—কি জাত না কি জাত ছুঁয়ে ধম্ম পুণ্যি ত করে' এলেন খুব। হরিবোল! হরিবোল! বাঁকাশ্যাম! মদন-মোহন!

* * * *

সে রাত্রিটা কোনও রকমে কাটিল, কিন্তু তাহার পরদিন বড় একটা মজার ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকালে উঠিয়াই অজিতকে সঙ্গে লইয়া রমেশ সেই উকিলের

বাড়ীতে সব ঠিক করিয়া দিয়া আসিল। দুপুরে সে একবার খাইবার ছুটি পাইবে, তাহার পর বৈকাল পর্য্যন্ত কাজ করিয়া দলিল নকল শেষ হইয়া গেলেই তিনি তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিবেন।

বেলা এগারোটার সময় ছুটি পাইয়া অজিত 'হোষ্টেলে' স্নানাহার করিল, পরে আবার ছুটিল। পথে অতসীর সঙ্গে দেখা। সে তখন রাস্তার ধারে একটা 'ডাষ্ট্‌বিনের' পাশে বসিয়া গৃহস্থের ফেলিয়া-দেওয়া আবর্জ্জনার ভিতর হইতে বাছিয়া-বাছিয়া কয়লা কুড়াইতেছিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, তোর মা কেমন আছে, অতসী?

সহসা মুখ তুলিয়া অজিতকে দেখিয়াই অতসীর মুখখানা একবার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে কহিল, মা আজ আর উঠ্‌তে পারেনি বাবু! হ্যাঁ বাবু, ওই যে সরকারী হাঁসপাতালটায় ওর ওষুধ পাওয়া যায় না? তা হ'লে আমি একবার যাই।

এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই যেন সে এই বাবুটিকে খুঁজিতেছিল,—ও-কথাটা বলিয়া উত্তরের আশায় সে হাঁ করিয়া অজিতের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অজিত কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল, জানি না, তবে যাস্ একবার, দিতেও পারে। ও কি কুড়োচ্ছিস্, অতসী?

ছাই-এর গাদা হইতে একটি কয়লার টুক্‌রা কুড়াইয়া টুপ্‌

একজন জিজ্ঞাসা করিল, কিধার্‌সে আতা? কোন্ হ্যায় তোম্?

অপর একজন বলিয়া উঠিল, উহি মোকান্‌কা বাঙ্গালী-লউণ্ডা হোগা --

এম্‌নি করিয়া অজিতকে আর কথা বলিবার সময় না দিয়া কেহ বলিল, পাকড়ো উস্‌কো। কেহ বলিল, চোট্টা হ্যায় কেহ বলিল, ডাকু হ্যায়্।

সঙ্গে সঙ্গে মার্ মার্ করিয়া সকলে লাফাইয়া উঠিল। সমস্ত বস্তির মধ্যে একটা গোলমাল হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মেয়েরা কেহ লাঠি, কেহ কেরোসিনের 'লম্ফ' হাতে লইয়া উঠানে আসিয়া জড় হইল। গোলমাল শুনিয়া 'ইম্পিরিয়াল্ হোষ্টেল্' হইতে ম্যানেজার, প্রোফেসার, পঞ্চানন, রমেশ-প্রমুখ সকলে মিলিয়া মজা দেখিবার জন্য একেবারে রান্নাঘরের ছাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

অজিত তাহাদের দু'একটা কিল-ঘুষি খাইয়াই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ চক্ষু সে এড়াইতে পারিল না।

বস্তি হইতে এই অন্ধকার রাত্রিতে অজিত বাহির হইয়া আসিল, এবং এই গোলমাল নিশ্চয় তাহাকে লইয়াই, ম্যানেজার বাবু নিমেষেই তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। রমেশ পাশেই

দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি তাহার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কেমন? বলেছিলাম কি না রমেশবাবু, আপনার 'ফেরেণ্ড' এর ইয়ে তেমন সুবিধে নয়, তা আমি কাল্‌কের সেই ব্যাপারেই বুঝ্‌তে পেরেছি। হেঁ হেঁ বাবা, মানুষ চরিয়ে খাই, তার একবার দেখ্‌লে মানুষ চিন্‌তে পারিনে! কিন্তু শুনুন্, রমেশ-বাবু, আমি ওঁকে আর এখানে ঢুক্‌তে দিচ্ছিনে, হোটেলে আমার অনেক ভদ্রলোকের ছেলে বাস করে, —আপনার কিছু আপত্তি আছে?

রমেশ চুপি-চুপি বলিল, আপদ বিদেয় হ'লেই বাঁচি ম্যানেজার-বাবু, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না আমার অবস্থা? ঘাড়ে এসে চড়ে' বসেছে।

প্রোফেসার বলিয়া উঠিল, never mind। ওসব immoral লোককে এখ্‌খুনি ঘাড়ে ধরে' drive out করে' দিন। তা না হ'লে we must not live here।

এমন সময় অজিত উপরে উঠিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, পশ্চাৎ হইতে ম্যানেজার-বাবু হাঁকাইয়া বলিয়া দিলেন, কে, অজিতবাবু নাকি? দাঁড়ান্ ওইখানেই।

তাহার পর তিনি নিজেই ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কি কি জিনিষ আছে আপনার বলুন, বের করে' দিই।

ব্যাপারটা অজিত কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, কেন? কি?

সে-এক বিশ্রী অভদ্রোচিত মুখভঙ্গী করিয়া ম্যানেজার-বাবু বলিলেন, ন্যাকা! কচি খোকা আর কি! কিছু বোঝেন না! একাদশীকে ফাঁকি দিয়ে ডুবে' জল খেলে' চলে না বাবা! এই ত এই গামছা, এই কাপড়, আর কি?

ঘরের কোণে অজিত তাহার ছাতাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ওই ছাতিটা।

ম্যানেজার-বাবু এই তিনটা জিনিষ বাহিরে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, যা'ন অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। আর বেশী গোলমালে কাজ নেই। আমার পাওনা, দুই দুই—চার, আর একে পাঁচ-বেলার জন্যে পাঁচ-আনা করে' পাঁচ-পাঁচে পঁচিশ আনা,—একটাকা ন' আনা। দিতে হয় দিন, না হয় আমার ভাতের পয়সা ডুব্‌বে না, আর-জন্মেও শোধ কর্‌তে হবে। হরিবোল! হরিবোল! ছি, ছি, এইসব দুষ্কর্ম থেকে পরিত্রাণ আর কবে পাবো রে বাবা!

পকেট হইতে টাকা দুইটি বাহির করিয়া অজিত তাঁহার হাতে দিয়া বলিল, নিন্ আপনার পাওনা।

ম্যানেজার-বাবু টাকা-দুইটি মাটির উপর বার-কতক বাজাইয়া লইয়া বলিলেন, কত ফেরৎ হচ্ছে তা হ'লে? এক টাকা ন' আনা, আর সাত আনা দিলে দু-টাকা হয়, আচ্ছা—বলিয়া তিনি তাঁহার শিয়রের বালিশের তলা হইতে ক্যাশ বাক্সটি

খুলিয়া সাত আনা পয়সা বার-দুই-তিন ভালো করিয়া গণিয়া আলগোছে অজিতের হাতে ফেলিয়া দিলেন।

অজিত একবার ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, রমেশ-দাদা কোথায়? তাঁর সঙ্গে একবার—

না, না, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে' কাজ নেই। তিনি বেরিয়ে গেছেন, রাস্তায় দেখা হয় ত হবে। এই বলিয়া ঘন-ঘন হাত নাড়িয়া তিনি তাহাকে সেস্থান পরিত্যাগ করিবার ইঙ্গিত করিলেন।

অজিত সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া বাহিরে রাস্তা ধরিল। তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত কলিকাতা শহরটাই তখন দুলিতেছিল।

* * * *

ইহার পরে আরও মাস-খানেক কাটিয়া গেছে। কালীঘাটের কাছাকাছি ভবানীপুরের একটি বাড়ীতে অজিত একটি ছেলেকে পড়াইতেছে,—ইতিমধ্যে একটা চাক্‌রীও নাকি সে পাইয়াছিল।

সেদিন সকালে ছেলেটিকে পড়ানো শেষ করিয়া অজিত বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় দরজার নিকট এক ভিখারিণী আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে একটি মাটির পাত্র, মুখে একটা শরের কাঠি।

ছাত্রটি বলিয়া দিল, ও রোজ এম্‌নি করে' ভিক্ষে করে মাষ্টার মশাই, কথা কয় না, ও মৌনী।

কিন্তু অজিত তাহাকে দেখিযাই চিনিল। এ সেই অতসীর মা। এই অসহায়া উপায়হীনা নারীর মিথ্যা অভিনয়কে সে আজ অবজ্ঞা করিতে পারিল না,—তাহার হাতে প্রবঞ্চিত হইবার গৌরবটুকুর জন্ম লালায়িত হইয়াই অজিত যেন তার পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার মাটির পাত্রে ফেলিয়া দিল।

অতসীর মা এতক্ষণ হেটমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার ভিক্ষাপাত্রের উপর টাকা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। অভাবের তাড়নায় মিথ্যার মুখোস পরিয়া দ্বারে-দ্বারে যে প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়ায়, তাহাকেও আশাতিরিক্ত দান যে করিতে পারে, সে-দাতার মুখখানি কেমন, তাহাই একবার দেখিবার জন্য সে মুখ তুলিয়া চাহিল,—কিন্তু অজিত তখন তাড়াতাড়ি রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছে বলিয়া ভালো দেখিতে পাইল না। তাই সে-লোকটিকে একবার অতর্কিতে দেখিয়া লইবার জন্যই অতিশয় সঙ্কোচে সে তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দুর গিয়া অতসীর মা তাহাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু চিনিবামাত্র তাহার শীর্ণ হাত দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, —মাটির পাত্রটি হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া যাইবার জো হইল, তাড়াতাড়ি সেটিকে দু-হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বিপরীত দিকে বাড়ীর পথ ধরিল। চোখ-দুইটা তখন তাহার জলে ছল্ ছল্ করিতেছিল।

———

ব্যানার্জী

ব্যানার্জ্জী

পুরাদমে থিয়েটারের রিহার্সাল চলিতেছিল। যাহারা থিয়েটার করিবেন, তাঁহারা সকলেই পশ্চিমের একটা বড় লোহার কারখানার কর্ম্মচারী। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেহ-বা কারখানায় কেহ-বা অফিসে কাজ করিয়া রাত্রে লক্ষ্মীবাবুর বাহিরের বসিবার ঘরটায় জড় হইয়াছেন। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর, এতক্ষণে সকলের মুখে একটুখানি হাসি দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল;— থিয়েটার হউক আর না-ই হউক, চাকুরীজীবী এই হতভাগ্যদের নিরানন্দ পরিম্লান মুখে এই যে একটুখানি হাসি, ইহাই যথেষ্ট।

লণ্ঠনের সুমুখে বই খুলিয়া একজন হাত মুখ নাড়িয়া খুব করিয়া জোর গলায় বলিয়া দিতেছিল, এবং তাহাই শুনিয়া শুনিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জনকতক ছোক্‌রা বক্তৃতা করিতেছিল।

বক্তৃতাকারীদের মধ্যে একজনকে উদ্দেশ করিয়া কে যেন বলিয়া উঠিল, অমন চিঁ-চিঁ কোর্‌ছ কেন বাপু,—একটু হেসে' হেসে' বেশ জোরে-জোরে বল্‌তে হবে। এটা কমিক্ পার্ট, বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

—বলে' তো দিচ্ছ কমিক্ পার্ট, হেসে' হেসে' বল্‌তে হবে।

বুঝ্‌তেও সব পেরেছি, কিন্তু কি জান? ওবেলা থেকে বাবা উদরে অন্নং নাস্তি।

—কেন?

কেন আবার? গিন্নি চিৎপটাং। শালার জ্বর, উঠ্‌বি তো ওঠ্‌ একেবারে একশো তিন।

—ব্যানার্জ্জীকে ডাক্‌লে না কেন?

—কই আর দেখ্‌তে পেলুম তাকে?

—আজ কি সে হতভাগা রিহার্সালে আসেনি নাকি? ব্যানার্জ্জী! ব্যানার্জ্জী!

ক্ষুদ্র সেই অপরিসর গৃহের মধ্যে একটা শতচ্ছিন্ন চটের উপর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উবু হইয়া বসিয়া সকলে বক্তৃতা শুনিতেছিল। ব্যানার্জ্জীর সন্ধানে এ-উহার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল, কিন্তু, ব্যানার্জ্জী তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই। সুতরাং বক্তৃতা আবার আরম্ভ হইল,—আরে রে দুর্ব্বৃত্ত, পালাবি কোথায়? ভুজদ্বয় কার্ম্মুক আমার! —এই বলিয়া অভিনেতা তাহার অস্থিচর্ম্মসার ভুজদ্বয় প্রসারিত করিয়া আস্তিন্ গুটাইতে লাগিল।

যে ব্যক্তি বই খুলিয়া 'প্রম্প্‌ট্‌' করিতেছিল, সে বলিল, ও ঠিক হলো না সতীশ, শ্রীশবাবুকে তেড়ে নিয়ে যেতে হবে।

সতীশের তাড়া খাইবার ভয়ে শ্রীশ পূর্ব্বাহ্ণেই প্রস্থান করিয়াছিল। সতীশ তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যানাৰ্জ্জী

দেওয়ালের কোল ঘেঁসিয়া একটি লোক বসিয়া ছিল, অন্ধকারে তাহাকে ভাল চিনিতে পারা গেল না। সতীশ বলিল, কে ও?

—আমি হে আমি।

নাম না বলিলেও পরিচিত গলার স্বরে সতীশ এবং শ্রীশ দুজনেই বলিয়া উঠিল, ব্যানাৰ্জ্জী যে!

—এখানে কেন হে ব্যানাৰ্জ্জী,—ঘরে চল, ঘরে চল। ওহে, সুরেন, কি জন্যে খুঁজছিলে, এই দ্যাখ তোমার ব্যানাৰ্জ্জী এসেছে!— এই বলিয়া সতীশ পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, ব্যানাৰ্জ্জী তাহার কাপড়টা টানিয়া ধরিল, বলিল, আমি আর ঘরে ঢুকবো না সতীশবাবু, তোমরা আমায় খালি ভেগো দিয়ে রাখছো। [illegible] একটা পার্ট ফার্ট দাও আমাকে। বক্তৃতা আমাকে একটা না দিলে আমি আর তামাক সাজতে এখানে আসব না।

কথাটা ভিতরের সকলেই শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা বুঝিল, ব্যানাৰ্জ্জী অভিমান করিয়াছে। 'একাউন্ট ডিপার্টমেণ্টের' বড়বাবু দুইজন ছোক্‌রাকে হাতের ইসারা করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিতে বলিলেন, অতিকষ্টে ধরাধরি ঠেলাঠেলি করিয়া ব্যানাৰ্জ্জীকে তাহারা ঘরে লইয়া আসিল। কিন্তু ব্যানাৰ্জ্জীর মুখখানা দেখিয়া সকলেই প্রায় সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাকে লইয়া সকলে হাসি ঠাট্টা করে বটে, কিন্তু এরকম তো কেহ কোন দিন করে না। ব্যানাৰ্জ্জী হতভম্ব হইয়া চারিদিকে তাকাইতে

লাগিল, কিন্তু যাহার দিকে তাকায়, সে-ই হাসিয়া উঠে। সে ভাবিল, বুঝি-বা ইহাও তাহাকে লইয়া একটা আমোদের ষড়যন্ত্র, জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে দেখে তোমরা হাস্‌চো কেন হে?

একজন বলিল, তোমার একধারের গোঁফগুলো কে উড়িয়ে দিলে ব্যানার্জ্জী?

কথাটা ব্যানার্জ্জী যদিও বিশ্বাস করিল না, তথাপি একবার হাত বুলাইয়া দেখিল, কিন্তু হাত দিতে গিয়া সত্যই তাহার একধারের গোঁফগুলা নাই বলিয়াই বোধ হইল। বলিল, তা হবে। মেসের ছোকরাগুলো যে রকম বজ্জাত, দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সেই সময় দিয়েছে হয়ত উড়িয়ে। তা যাকগে, আবার গজিয়ে উঠবে। কিন্তু দেখুন বড়বাবু, আমায় একটা কিছু, বক্তৃতা টক্তৃতা না দিলে,

বড়বাবু বলিলেন, নিশ্চয়। তোমায় দিতে হবে বই কি! ওহে বিরাজ! ব্যানার্জ্জীকে একটা পার্ট না দিলে চল্‌বে কেন? দাও।

একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, হনুমানের বক্তৃতা ব্যানার্জ্জী বেশ পারে, একটি লেজ দিলে দিলেই হয়।

ব্যানার্জ্জী বলিল, হনুমান তোমার এ মহাভারতের 'প্লেতে' কোথায় পাবে হে নরেশ? সে রাবন বধ হতো ত' দেখা যেতো। কিন্তু একটি কথা আছে বিরাজবাবু, আমায় এমন একটি বক্তৃতা দাও, যাতে আমি এমনি করে তরোয়ার ঘুরিয়ে অনেকক্ষণ যুদ্ধ

করতে করতে কাউকে বধ করতে পারি।---এই বলিয়া বড়বাবুর ছড়িটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া ব্যানার্জ্জী লাফাইয়া লাফাইয়া তলোয়ার ঘুরাইবার কৌশল দেখাইতে লাগিল।

সুরেন বলিল, থামো থামো ব্যানার্জ্জী, বক্তৃতা তুমি কাল করো হে, আজ আমার ঘরে একবার এসো ভাই!

বড়বাবু হাসিতেছিলেন। বলিলেন, হ্যাঁ ব্যানার্জ্জী আজকে তুমি একবার সুরেনের বাসায় যাও। ওর বৌএর বড় অসুখ,--দিনকতক চালিয়ে দাও গে।

ব্যানার্জ্জীর তলোয়ার সমান ভাবেই ঘুরিতে লাগিল। থামো থামো, বলিতে বলিতে দর্শকবৃন্দ বসিয়া বসিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া কোণ-ঘেঁসা হইয়া গেল।

সুরেন বলিয়া উঠিল, তুমি কি তাহ'লে যাবে না, নাকি হে ব্যানার্জ্জী?

এতক্ষণে ব্যানার্জ্জী কথা কহিল, বলিল, আমি শালা যেন ভাত রাঁধতেই জন্মেছি! যাও যাব না, যাও।

সুরেন বড়বাবুর কানের কাছে গিয়া বলিল, তাহ'লে আমি নিজেই চড়াইগে, বড়বাবু পারেন তো ওকে এরপর পাঠিয়ে দেবেন। এই বলিয়া চলিয়া যাইবার জন্য সুরেন জুতা পরিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী বোধ করি ক্লান্ত হইয়াই তলোয়ার ঘুরানো থামাইয়া বলিল, চল্লে নাকি হে সুরেন? ভাত তোমার ঘরে ঢাকা দেওয়া

আছে দেখগে। মন্টিকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে। ব্যানার্জ্জীকে বাবা তেমন ছেলে পেয়ে যাওনি হেঁ হেঁ! খবরও নিয়েছে, ভাতও রেঁধে দিয়ে এসেছে।---বলিয়াই সে তাহার গোঁফে একবার হাত বুলাইয়া বলিল, তাই তো বলি মন্টি আমায় দেখে হাস্‌ছিল কেন? এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি বড়বাবু, এ ঠিক সেই মেসের ছোক্‌রাদের কাজ! কাল থেকে আর যদি মেসে ঘুমাই তো এই রাম, দুই, তিন।

ব্যানার্জ্জী তিনবার নিজের কান মলিয়া শপথ করিল। সমস্তদিন এক প্রকার উপবাসের পর এই সুসংবাদ পাইয়া সুরেন ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। ব্যানার্জ্জীকে একবার ধন্যবাদ দিবার অবসর পর্য্যন্তও তাহার হইল না। সেটা ব্যানার্জ্জীর দুর্ভাগ্য! কারণ, এই কারখানার আড়াই শ' বাবুর যে কোন দুঃখ-দুর্দ্দিনে এই অশিক্ষিত অসভ্য লোকটাকেই সকলের ডাক পড়ে, কিন্তু ধন্যবাদ সে কাহারও নিকট কোনোকালেই পায় না। কিন্তু সে কথা যাক্‌।

ব্যানার্জ্জী পকেট হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া বিরাজের হাতে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, দুপয়সার কাগজ কিনে খাতাসুদ্ধ বেঁধে এনেছি বিরাজ। দেখুন বড়বাবু, আজ যদি বক্তৃতা আমি মুখস্ত করতে না পাই তো আমারই একদিন, কি ওরই একদিন।

ব্যানাৰ্জ্জী

বড়বাবু বিরাজকে চোখ টিপিয়া বলিয়া দিলেন, তুমি সেই দৌবারিকের পার্টটা প্রম্প্ট্ কর না হে বিরাজ,—ব্যানাৰ্জ্জী বলুক্।

বিরাজ বলিল, তাহ'লে উঠুন আপনি রাজা উঠুন, লক্ষীবাবু, আপনি উঠে দাঁড়ান।

বস্তুতঃ লক্ষীবাবু রাজা সাজিতেন। অফিসে তিনি গুদামের বড়বাবু—চুরি চামারি করিয়া বেশ পয়সাও করিয়াছিলেন। কাজেই ইজ্জতের ভয়ে ব্যানাৰ্জ্জীর মত ছয় টাকা বেতনের নগণ্য একটা বর্ব্বরের সহিত রহস্য করিতে তিনি একটুখানি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু বড়বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই যখন এক বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তখন বাধ্য হইয়া অনুরোধে তাঁহাকে ঢেঁকি গিলিতে হইল। লক্ষীবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বড়বাবু বিরাজের হাত হইতে বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, দাও দাও, এসব তোমার কম্ম নয়, আমি বলে' দি।

খামোখা চোখের সম্মুখে বইখানা খুলিয়া ধরিয়া বড়বাবু ব্যানাৰ্জ্জীকে প্রম্প্ট্ করিতে লাগিলেন,—বল, আরেরে দুর্ব্বৃত্ত দুর্ম্মতি দুরাচার! কুলের অঙ্গার! তুই মোরে করিবি বন্দী!

ব্যানাৰ্জ্জী ছড়ি তুলিয়া বীররসে তাহাই বলিল।

বড়বাবু আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আরে-রে দুর্ভাগা, আমি নহি শুধু পাচক ব্রাহ্মণ, আমি তোর কৃতান্ত কালান্তক যম! হতভাগা! কুলাচার! দুরাচার!

ব্যানার্জী দুরাচার পর্যান্ত বলিয়া রাগের মাথায় আর থামিতে পারিল না। বক্তৃতার উত্তেজনার চোটে তাহার উপরেও হারামজাদা এবং পাজি এই দুইটা কথা বলিয়া ফেলিল।

ব্যানার্জীর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ হইতেই এই বেল্লিকটার উপর লক্ষ্মীবাবু মনে মনে চটিতেছিলেন, এইবার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। কোনও কথা না বলিয়া পাশের একজন বাবুর হাত হইতে তাঁহার বেতের ছড়িটা তুলিয়া তিনি ব্যানার্জীর পিঠের উপর সপ্ সপ্ করিয়া দুইটা চাবুক বসাইয়া দিলেন।

বড়বাবু হাঁ হাঁ করিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিতেই লক্ষ্মীবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আপনারাই তো এই ছোট লোকটাকে ইন্‌ডাল্‌জেন্স (indulgence) দিয়ে মাথায় তুলেছেন বড়বাবু! ষ্টুপিড্, সোয়াইন্! যেমন লোক, তেম্‌নি থাক্‌তে হয়। বেরিয়ে যা বল্‌ছি হারামজাদা, আমার বাড়ীতে বসে অনেকক্ষণ থেকে যা না তাই আরম্ভ করেছে। শুধু আপনারা হাস্‌চেন ব'লেই আমি কিছু বলিনি। এটা মেয়ে-ছেলের ঘর নয়, না? এই বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে লক্ষ্মীবাবু বসিয়া পড়িলেন।

বেচারা ব্যানার্জী অত্যন্ত অপ্রস্তত হইয়াই, মুখ চুন করিয়া জনতার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বলিল, এমন জান্‌লে কোন্ শালা উঠ্‌তো মাইরি!

ব্যানার্জ্জী

সমবেত লোকজনের উচ্ছ্বসিত হাসির রোল তখন একেবারেই নীরব হইয়া গিয়াছিল।

১

ব্যানার্জ্জীর ইতিহাস এইখানে একটুখানি না বলিলেই নয়।

ব্যানার্জ্জীর পুরা নাম, রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ী। কুলিন ব্রাহ্মণের সন্তান। গ্রামে তাহার থাকিবার মত একখানা ঘর আছে, জমিজমা এক কাঠাও নাই। আত্মীয় স্বজনও কেহ নাই যে, তাহাকে ঘরে বসিয়া খাইতে দিবে, তাই তিন চার বৎসর পূর্ব্বে সে এই লোহার কারখানায় কাজ করিতে আসে। প্রথমে সে বাবুদের মেসে, এবং ইহার-উহার বাসায় ভাত রাঁধিত, পরে একদিন কপাল ঠুকিয়া অফিসের বড়সাহেবকে তাহার দুঃখ নিবেদন করিয়া বলিয়া ফেলিল, হুজুর, হাম বামুনকা ছেলে হ্যায়, ভদ্রলোক হ্যায়, ভাত রাঁধতে আর নাহি পারতা হ্যায়।

তাহার কথাগুলা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, তাহার মলিন কাতর মুখখানা দেখিয়া সাহেবের বোধকরি দয়া হইল। তাঁহাদের 'টেনিস্ গ্রাউণ্ড্' এবং ফুলের বাগানে কুলি-কামিন খাটাইবার কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বেতন ধার্য্য হইল মাসিক ছয় টাকা। তাহাতেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইল, ভাত আমি আর রাঁধছি না বাবা, এবার অফিসের

চাক্‌রী! খাতায় রীতিমত সহি পর্য্যন্ত করে' দিতে হয়। ব্যস্‌, খাব দাব, ফুর্ত্তি কর্‌বো। আমার চাল না চুলো, মাগ না ছেলে!

কুলি কামিন, খালাসী ইত্যাদি কারখানার প্রায় সকলকেই সে জানাইয়া দিল, বামুনঠাকুর বলে' খবরদার আর কেউ ডাকিস্‌ নে আমায়। এবার বাবা অফিসের চাক্‌রী নিয়েছি, ব্যানার্জ্জীবাবু বলে' যদি না ডাকিস্‌ তো অতিবড় দিব্যি রইলো শালাদের। গুষ্টিসুদ্ধ মাথা খেয়ে দেব তা না হ'লে! জানিস্‌?

তাহারা তো দূরের কথা, সেই হইতে অফিসের বড়বাবু হইতে ছোট বেহারা পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ব্যানার্জ্জী, ব্যানার্জ্জীবাবু বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। তাহার আমোদ-আহ্লাদ এবং খুসীর আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু ভাত তাহাকে রাঁধিতেই হইত। কাহারও বাড়ীতে রাঁধুনী নাই শুনিলে, অনাহূত ভাবেই সে তাহার বাড়ী রান্না করিতে ছুটিত। মেয়েছেলে লইয়া রাঁধুনী অভাবে কেহ উপবাস করিতেছে শুনিলে তাহার আর সহ্য হইত না। কাহারও বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হইলে, কিংবা কেহ দুঃখে-কষ্টে পড়িলে ব্যানার্জ্জীকে কিছু বলিতে হইত না,—সংবাদটা তাহার নিকট যেন হাওয়ায় ছুটিয়া যাইত।

বড়বাবুর রাঁধুনী পলায়ন করিয়াছিল, বৌ তাঁহার রাঁধিতে গেলেই হাত পুড়াইয়া ফেলে, সুতরাং গত মাসখানেক ধরিয়া ব্যানার্জ্জীকে দুইকাজ বজায় রাখিতেই হইতেছিল। বিরাজ সেদিন

হাসি-ঠাট্টা করিয়া বলিল, কিহে বামুন ঠাকুর, ভাত যে রাঁধ্‌বে না বল্‌ছিলে ?

ব্যানার্জ্জী রাগিয়া বলিল, আমি ত' কারো বাড়ী চিরকালের মাইনে-করা রাঁধুনী নই হে বাপু! দুদিন চালিয়ে দিচ্ছি বই তো নয়। আমি বাবা, নিজের লাভ না থাক্‌লে কোথাও থাকি না! ছ'টাকায় ডাল ভাত খেতাম, এখন মাছটা দুধটা সবই পাই। সে খবর রাখ? না, ফট্‌ করে' বামুন ঠাকুর বলে' বস্‌লে!

এমনি করিয়াই ব্যানার্জ্জীর দিন কাটিতেছিল।

হঠাৎ বড়সাহেব বিলাতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে একজন কড়া মেজাজের মিলিটারী সাহেব কারখানায় আসিয়া বহাল হইলেন। এই কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাপ্রভু, কোম্পানীর অপব্যয় সঙ্কোচ মানসে যোগ্যতার বিচার করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ব্যানার্জ্জীকেই ছাঁটিয়া দিলেন। আর কাহারও বাড়ীতে মাহিনা লইয়া ভাত রাঁধিব না, ইহা সে বহুপূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কাজেই মনের দুঃখে ব্যানার্জ্জী বাধ্য হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে একমাত্র তাহার সেই পৈতৃক বাসভবনটুক ছাড়া তাহার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার কেহ নাই।

গ্রামে ফিরিয়া ব্যানার্জ্জী ভাবিয়াছিল, সঙ্গে পাঁচটি টাকা

আছে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ম সেখানে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি বিশ্রাম করিয়া লইবে। কিন্তু বিশ্রাম করা দূরে থাক্, বসিবার জায়গাটি পর্য্যন্ত মিলিল না। বাড়ীটা তাহার একপ্রকার খোলাই পড়িয়া থাকিত। কিন্তু এবার দেখিল, তাহারই প্রতিবেশী এবং বন্ধু সদানন্দ ঘোষাল সপরিবারে সেইখানে বাস করিতেছে। কোন্ সূত্রে যে তাহারা উড়িয়া আসিয়া বাড়ীখানা জুড়িয়া বসিয়াছে তাহার সংবাদ লইতে গিয়া ব্যানাজ্জী যাহা শুনিল তাহাতে তাহার আর যাহাই হউক, আনন্দ হইল না।

এই সদানন্দ ছোকরাটির সহিত স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে সে একসঙ্গে পড়িয়াছিল। সেও ঠিক তাহারই মত হতভাগা। বেশীদূর পড়িতে পারে নাই, তাহার উপর বিবাহ করিয়া তিন চারিটি ছেলে-মেয়েও হইয়াছে। গ্রামে সে একটি পাঠশালা খুলিয়াছিল, যাহা পাইত, কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে তাই দিয়া তাহাকে সংসার চালাইতে হইত, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে, গত মাসে তাহার ঘরখানিও আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। কাজেই, তাহার সংসারটি লইয়া ব্যানাজ্জীর বাড়ীতেই মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া তাহার আর অন্ত কোনো উপায় ছিল না, তাই সে এইখানেই উঠিয়া আসিয়াছে। মানুষের কপাল তাহার সঙ্গেই ফিরে, এখানে আসিয়াও সে যে বিশেষ সুখে আছে

তাহা নয়। গত পনের দিন ধরিয়া জ্বরে সে শয্যাগত। উঠিবার সামর্থ্যটুকু পর্য্যন্ত নাই। বাঁচিবে কিনা তাহাই সন্দেহ।

রুগ্ন কঙ্কালসার সদানন্দ জ্বরের ঘোরে ঘরের ভিতর ছট্‌ফট্ করিতেছিল। তাহার স্ত্রী বাহিরের চালায় উনানে আগুন ধরাইয়াছে, বোধ করি বা কিছু রান্না হইবে; ক্ষুধার্ত্ত ছেলে মেয়েগুলা মাকে ঘিরিয়া খাবারের জন্য সমস্বরে চীৎকার সুরু করিয়া দিয়াছে। সদানন্দের মেজাজটাও একটুখানি খিট্‌খিটে হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যানার্জ্জীকে আদ্যোপান্ত সমস্ত পরিচয় দিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। সহসা বাহিরের কয়লার ধোঁয়া এবং ছেলেদের চীৎকারে অতিষ্ঠ হইয়া সদানন্দ বলিয়া উঠিল, মর, মর, শালার ছেলেরা মরে যা, এ পাপ যে কেন করেছি ভাই, তার ঠিক নেই। খালি দুহাত দিয়ে আমি মরে গেলে,—হ্যাংলা কুকুরের মত দোরে দোরে ঘুরে বেড়াতে হবে দেখে নিস্।—আঃ এত ধোঁয়া কিসের? খেতে তো দিবিনে, শুধু ধোঁয়া খাইয়েই আমায় মেরে ফ্যাল।

ব্যানার্জ্জী এতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি খেয়েছ সদাই?

—খেয়েছি, খেয়েছি দুমুঠো আখার ছাই। আজ দশদিন ধরে নেড়ীর মা কি কিছু খেতে দিচ্ছে, যে খাব? খালি বলছে খেলে মরে যাব। যেন ডাক্তারের হুকুম আর কি!—এই পর্য্যন্ত

বলিয়াই সে খক্ খক্ করিয়া কাশিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী তাহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। তাহার সাত আট বছরের বড় মেয়েটাই পিতার শুশ্রূষা করিতেছিল। তাহাকে কহিল, ডাক্তার এসেছিল রে নেড়ী?

—ডাক্তার কোথায়? সেই নন্দ কোব্‌রেজ। পরশু বড়ি আন্‌তে গেলাম, বল্‌লে সাড়ে তিনটি টাকা আনিস্ তবে বড়ি দেব। এবারে কি একটা ভাল ওষুধ দিতে হবে যে, তার দাম অনেক।

সদানন্দ ইতিমধ্যে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়াছিল, বলিল, হ্যাঁ ভাই, বলে মকরধ্বজ দিতে হবে। সে আবার আশী টাকা তোলা। আমি "বাজবান্দা" দিয়েছি। কাজ নাই আর ওষুধে ভাই। বাঁচি বাঁচ্‌বো এতেই বাঁচ্‌বো। নইলে—

কথাটা তাহার শেষ হইল না। গলায় কাশি এবং চোখে জল আসিয়া তাহার সে শেষের চিন্তাটা তাহাকে যেন ভাবিতেই দিল না। সে তাহার ছিন্ন মলিন বালিসে মুখ গুঁজিয়া ধাক্কাটা যেন সাম্‌লাইতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী বসিয়া থাকিতে থাকিতেই মায়ের ডাকে নেড়ী উঠিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাটিতে করিয়া খানিকটা জল-বালি আনিয়া তাহার পিতার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, নাও বাবা, খাও। দেখ্‌চো পেঁচি আর ডাবি অর্দ্ধেকটা খেয়ে দিলে।

সদানন্দ ঢক্ ঢক্ করিয়া সেটুকু এক চুমুকে শেষ করিয়া দিয়া

জিভ দিয়া বাটিটা চাটিতে চাটিতে নেড়ীকে এক ধমক দিয়া বলিল, জল চাই নে? দে জল দে। আচ্ছা মেয়ে বাবা। পরক্ষণেই ব্যানার্জ্জীর দিকে তাকাইয়া বলিল, হ্যাঁ পেট্টা এতক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হলো। আর এই ঢ্যাখ ভাই, এই আমার সারাটা দিনের আহার, এই এক পয়সার বার্লি' তাও আবার ছেলেমেয়ের দায়ে

নেড়ী জল আনিয়া দিল।

ব্যানার্জ্জী "আসি" বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বাহিরে উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

সেইদিন বৈকালে পাঁচটি টাকার মধ্যে চারিটি টাকা সদানন্দের হাতে দিয়া ব্যানার্জ্জী বলিল, আমি আজই কারখানায় ফিরে যাচ্ছি সদাই। পারিতো আরও কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি। ডাক্তার কোব্রেজ দেখাস্, নইলে মরে যাবি। মাগ ছেলে পথে দাঁড়াবে।

ব্যানার্জ্জী সেই দিনই পুনরায় তাহার পরিত্যক্ত লোহার কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ষ্টেশনের পথে গ্রামের একটি ছোক্‌রার সহিত দেখা হইতেই সে বলিয়া উঠিল, কি রামভদ্রদা যে? কবে এসেছিলে? কারখানায় আমাদের একটা চাকরী টাক্‌রী জোগাড় করে' দিতে পার?

—আচ্ছা দেখ্‌ব। বলিয়া ব্যানার্জ্জী চলিয়া যাইতেছিল।

ছোক্‌রা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মনে থাক্‌বে তো? মিছে কথা নয় রামভদ্রদা, বড় কষ্টে পড়েছি ভাই। আর না হয় বলত একখানা

চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দেব। সাহেব টাহেবকে বলে' দেখো।

—আচ্ছা দিও। বলিয়া ব্যানার্জ্জী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

৩

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে ব্যানার্জ্জী, গেলে আর ফিরে এলে, ব্যাপার কি? ভাতই রাঁধো বুঝলে? ছ' টাকার চাক্‌রী গেল ত' তোমার বয়েই গেল।

ব্যানার্জ্জীকে আজ না বলিলেও বোধ করি সে রাজি হইত. সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই আজ সে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পরদিন প্রাতে বড় সাহেবের "টাইপিষ্ট"কে ব্যানার্জ্জী ধরিয়া বসিল, তোমায় একটা কাজ করে' দিতে হবে ভায়া, বেশ ভাল কাগজে, আর বেশ ভাল করে' আমার একটা দরখাস্ত তোমার ওই কলটায় ছেপে দিতে হবে ভাই।

—কিসের দরখাস্ত ব্যানার্জ্জীবাবু?

ব্যানার্জ্জী একবার চারিদিক্ বেশ ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, কেহ আসিতেছে কিনা। তারপর চুপিচুপি বলিল, লিখে দাও, তুমি যে এত লোক থাক্‌তে আমার চাকরীটি খেলে সাহেব, আমি এবার কোথায় যাই বলত? এইখানে চাক্‌রী করতে এসে আমি যে এ, বি, সি, ডি পর্য্যন্ত ভুলে গেছি, এখানে ছাড়া আমায় তো আর কোথায়ও কেউ চাক্‌রী দেবে না সাহেব। তুমি যদি আমায় ফের

বহাল না কর, তাহ'লে আমাদের গাঁয়ের রক্ষিনী ঠাকুরের মাথায় তোমার নামে ফুল চড়াবো সাহেব, আমার পৈতে-টৈতে সব ছিঁড়ে ফেল্‌বো,—দেখি কেমন করে' তোমার ভাল হয়।—এই কথাগুলি বেশ করে' গুছিয়ে ভাল ইংরাজিতে তোমায় লিখে দিতে হবে টাইপবাবু, আমি বামুনের ছেলে হয়ে এই তোমার হাতে ধর্‌ছি।

টাইপিষ্ট প্রথমে আপন মনেই খানিকটা হাসিয়া একটা কাগজের উপর মোটামুটি একটা চাক্‌রীর দরখাস্ত ছাপিয়া দিয়া, নীচে Yours obediently লিখিয়া বলিল, এইবার সহি করে সাহেবের হাতে দাওগে, বুঝ্‌লে?

কাগজখানা হাতে লইয়া ব্যানার্জ্জী বলিল, সব কথাগুলি লিখেছ ত? একটিও ভুল হয়নি? তবে দাও তোমার কলমটা আমি সই করে' দিই।

টাইপিষ্ট তাহার হাতে কলমটা দিতেই ব্যানার্জ্জী চর্ চর্ করিয়া সহি করিয়া দিল, Banerjee Babu।

টাইপিষ্ট বলিয়া উঠিল, ছি, ছি, কর্‌লে কি হে ব্যানার্জ্জী, Yours obediently কথাটার নীচে তোমার সহি কর্‌তে হতো, তুমি উপরে করে' দিলে? আচ্ছা, আর একটা ছেপে দিচ্ছি।—এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ব্যানার্জ্জী বলিল, বা, সাহেবের চিঠি বুঝি আমি দেখিনি? তাদের বেলা বুঝি আলাদা নিয়ম? সেই ম্যানেজার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এই সব

লেখা থাকে, আর সাহেবেরা সহি করে তাহার উপরে, আর আমি শালা লেখাপড়া জানিনে বলে' নীচে সই করবো? এত মুখ্খু পেয়ে যাওনি তুমি আমাকে টাইপবাবু, আমি সব জানি।

টাইপিষ্ট হাসিতে হাসিতে বলিল, তবে দাওগে, সাহেব ওই ঘরে বসে আছে। বলিয়া সে সাহেবের কামরার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

একটা লম্বা সেলাম ঠুকিয়া সাহেবের হাতে কাগজখানা দিতেই সাহেব ব্যানার্জ্জীর মুখের পানে একবার তাকাইয়া সেখানা পড়িয়া দেখিলেন, বলিলেন, টোম্ কুলি খাটানে সাকেগা?

ব্যানার্জ্জী আর একটা সেলাম করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর, চিরকাল ত আমি এই কাজ কর্‌তা হায়্।

--বহুৎ আচ্ছা, যাও। ডশ্ রোপিয়া টলব্ মিলেগা। বলিয়া তিনি ষ্টোর সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টকে একখানি চিঠি লিখিয়া দিলেন।

দশ টাকা বেতনে ব্যানার্জ্জী আবার চাকরীতে বহাল হইল। সাইডিং লাইনের পাশে, এবং কারখানার যেখানে সেখানে অনেক লোহার টুক্‌রা, ভাঙা কল-কব্জা পড়িয়া ছিল; সম্প্রতি চল্লিশ পঞ্চাশজন কুলি-কামিনী লইয়া ব্যানার্জ্জীকে সেইগুলা গণিয়া জড় করিতে হইবে।—ইহাই হইল ব্যানার্জ্জীর কাজ।

সকাল সন্ধ্যা বড়বাবুর ঘরে রান্না, এবং দুপুরে ঘণ্টা

তিন-চার কুলি-কামিন খাটানো—ব্যানার্জ্জীর এই দুইটা কাজই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ্ এই যে, মাসের শেষ না হইলে টাকা পাওয়া যাইবে না, অথচ, টাকা না পাঠাইলে সদানন্দ বুঝিবা তাহার ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া মরিয়া যায়!······ধার কর্জ্জ করিতে গেলেও তাহাকে কেহ টাকা দিবে না। কি যে করিবে ব্যানার্জ্জী তাহাই ভাবিতে লাগিল।

জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্নে একেত সেই উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর আগুন ঝরিত। তাহার উপর, কারখানার আগুন, টিন, লোহা, সমস্তই এত বেশী উত্তপ্ত হইয়া উঠিত যে, খালি মাথায় তিন-চার ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে ব্যানার্জ্জীর বড় কষ্ট হইতেছিল। ব্যানার্জ্জী ভাবিল, তা হোক্—আজ সে সাহেবের নিকট একটা ছাতির দাম চাহিয়া লইবে, এবং সম্প্রতি সেই টাকা কয়টি সদানন্দকে পাঠাইয়া দিলেই চলিবে।

এই ভাবিয়া ব্যানার্জ্জী সেই দিনই সাহেবের নিকট গিয়া একখানি ছাতির জন্য তিনটি টাকা চাহিল। সাহেব তাচ্ছিল্য ভাবে কথাটাকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া দিলেন, চাকরী করিতে আসিয়া এত সুখ-সুবিধা চাহিতে গেলে চলে না। কোম্পানী তাহাকে ছাতি দিতে পারিবে না।

ব্যানার্জ্জীর দুঃখের আর অবধি রহিল না। পরদিন সে কুলি-কামিন খাটাইতে গিয়া তাহাদের বলিল, তোদের বড়

কষ্ট হয়, তোরা ঘুমোগে যা। তবে একটি কাজ তোদের কর্‌তে হবে। ছুটির সময় পয়সা নিতে গিয়ে তোরা প্রত্যেক দিন সাহেবকে বল্‌বি, যে, ব্যানার্জ্জীবাবুকে ছাড়িয়ে দাও সাহেব, আমাদের কাজ করিয়ে করিয়ে মেরে' ফেল্লে, একদণ্ড বস্‌বার সময় দেয় না। কেমন পার্‌বি ত?

সকলেই বলিল, কেনে লার্‌ব বাবু?

ব্যানার্জ্জী বলিল, আর একটি কথা আছে। বামুনের ছেলে বাবা, কিছু পেন্নামি দিতে হবে। তোদের যেমন কাজ কর্‌তে হবে না, তেম্‌নি প্রত্যেকে আমায় যাবার সময় দুটি চারিটি করে' পয়সা দিয়ে যেতে পার্‌বি ত?

—হঁ দিব।

সেই দিন হইতে এই নিয়ম চলিতে লাগিল।

সপ্তাহখানেক পরে, সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া একদিন ব্যানার্জ্জীকে ডাকিয়া বলিলেন, টুমি একঠো 'আম্‌ব্রেলা' পাইবে, আউর পঞ্চ্ রোপিয়া ইন্‌ক্রিমেণ্ট্।

কুলিদের নিকট হইতে ব্যানার্জ্জী প্রত্যহ প্রায় একটা করিয়া টাকা পাইতেছিল। তাহারাও কেহ-কেহ অন্যত্র খাটিয়া দ্বিগুণ রোজগার করিতে লাগিল।

এম্‌নি করিয়া দিন দশ পরে, সেদিন দুপুরবেলা ব্যানার্জ্জী পোষ্ট অফিসে গিয়া হাজির হইল। বিরাজ পোষ্ট অফিসে কাজ করিত।

ব্যানার্জ্জী

ব্যানার্জ্জী বলিল, দশটি টাকা মনিঅর্ডার করে' দাও ভাই বিরাজ। তুমি হচ্ছ পোষ্ট অফিসের লোক, যাতে তারা কাল সকালেই টাকাটা পায় তার একটুখানি ব্যবস্থা করে' দিতে হবে ভাই। বুঝ্‌লে?

বিরাজ বলিল, ঠিকানা বল।

ব্যানার্জ্জী, সদানন্দ ঘোষালের নাম ও ঠিকানা বলিয়া দিল।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া পিয়ন 'ডাক' বাছিতেছিল। বলিল, ব্যানার্জ্জীবাবু আপনার একখানি পোষ্টকার্ড আছে।

ব্যানার্জ্জী পোষ্টকার্ডখানি হাতে লইয়া একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাঙাহাতের লেখা পড়িতে না পারিয়া বিরাজের হাতে কার্ডখানি তুলিয়া দিয়া বলিল, পড়ে শুনিয়ে দাও ত' ভাই, কি লিখেছে।

বিরাজ পড়িল---

রামতনুদা, তোমাকে আমি যে একটি চাক্‌রীর কথা বলিয়াছিলাম, তাহার কতদূর কি করিলে লিখিবে। সাহেবকে বোধ হয় বলিয়াছ। তিনি কি উত্তর দিয়াছেন জানাইবে। আর যদি বল, চেষ্টা করিয়া আমি নিজেও একবার তোমার কাছে যাইতে পারি। আমার কষ্টের কথা তুমি সকলই জান। তোমাকে আর কি বলিব। এখানে ৺দেবতার বৃষ্টি আদৌ হয় নাই। ভয়ানক জলকষ্ট হইয়াছে।

ইতি—শ্রীরাধারমণ মণ্ডল।

এই বলিয়া পোষ্টকার্ডখানি উল্টাইয়া বিরাজ বলিল, আর একটু আছে হে ব্যানার্জ্জী। লিখ্‌ছে,—পুনশ্চ লিখি, তোমার বাড়ীতে সদানন্দ বাস করিতেছিল, তাহা বোধ হয় তুমি দেখিয়া গিয়াছ। বড় দুঃখের বিষয়, গত রাত্রে শ্রীশ্রী৺স্মরণ পূর্ব্বক সে স্বর্গলাভ করিয়াছে।

শেষের সংবাদটা শুনিয়া ব্যানার্জ্জী একবার চমকিয়া উঠিল। বিরাজের হাত হইতে চিঠিখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু হাতখানা তাহার এম্‌নিভাবে কাঁপিতেছিল যে, পোষ্টকার্ডখানি সে ধরিতে পারিল না, হাত হইতে পড়িয়া গেল। পুনরায় কুড়াইয়া লইয়া ব্যানার্জ্জী তাহার শতচ্ছিন্ন জামার পকেটে কার্ডখানি রাখিয়া দিল।

বিরাজ বলিল, তাহ'লে কাকে মনিঅর্ডার কর্‌বে হে? ঐ সদানন্দকেই টাকা পাঠাচ্ছিলে নয়? সে ত ফর্সা হয়ে গেল!

গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ব্যানার্জ্জী ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা লেখ, হরিপদ ঘোষাল। কিন্তু এ ছেলেটার নামে টাকা যাবে ত বিরাজ?

বিরাজ বলিল, নেহাৎ নেণ্ডি-গেণ্ডি নয় ত?

ব্যানার্জ্জী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নেহাৎ ছোট নয়, তবে বছর চার-পাঁচের হবে।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা, কেয়ার অফ্ লেট সদানন্দ লিখে দিচ্ছি।

—তাই দাও। বলিয়া মনিঅর্ডারের রসিদখানি লইয়া ব্যানার্জ্জী ধীরে ধীরে পোষ্ট অফিস হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে দুইজন অফিসের ছোক্‌রা কোথায় যাইতেছিল। ব্যানার্জ্জীকে দেখিতে পাইয়া একটুখানি রহস্য করিবার জন্য একজন তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া দিয়া বলিল, এসো হে ব্যানার্জ্জী বাবু, পান খাবে তো এসো।

ব্যানার্জ্জীর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিল, ছাড়, ছাড়, মাইরি, বিরক্ত করো না, ছাড়।

সে এক বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, বাপ্‌স্‌! এত মেজাজ্‌ কেন হে বামুন ঠাকুরের?

অপর ব্যক্তি বলিল, হবে না, আজকাল ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছে, টাকা জমাচ্ছে। দেখ্‌ছো না, পোষ্ট অফিসে বৌকে টাকাকড়ি হয়ত' পাঠিয়ে এলো। না, কিহে ব্যানার্জ্জী?

প্রত্যুত্তরে কোনো কথা বলা দূরে থাক, চোখ দিয়া তখন তাহার জল গড়াইতেছিল বলিয়া, ব্যানার্জ্জী একবার পিছন্‌ ফিরিয়া তাকাইতেও পারিল না।

জামাতা বাবাজীউ

জামাতা বাবাজীউ

১

দু'দিকের বড়-বড় বাড়ীর চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া বেচারা গলিটার যেন মারা পড়িবার জো হইয়াছে। অত্যাচারও কম হয় না ;—পাশের বাড়ীর যত প্রকার আবর্জ্জনা, এঁঠো পাতা, বাসি ভাত, উনুনের ছাই, পচা ইঁদুর, ছেঁড়া ন্যাকড়া, সবই এই গলির উপর আসিয়া পড়ে। এই দুর্গন্ধপূর্ণ পচা গলিটার সঙ্গে বেশ মানানসই হইয়া তাহারই এক দিকের এক কোণে বহুকালের পুরাতন একটা বাড়ী। বাড়ীটা যে কবে তৈরী হইয়াছে, হিসাব করিয়া ঠিক বলা যায় না। তবে, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য বাড়ীগুলার বৃদ্ধপ্রপিতামহ বলিয়াই মনে হয়। গলির দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া আধহাত-চওড়া বারান্দা, তাও আবার অর্দ্ধেকখানা ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সদর দরজায় না আছে কপাট, না আছে চৌকাঠ,— ইট-বাহির-করা শ্যাওলা-পড়া দেওয়াল হাতে অনেক বর্ষার, অনেক বৃষ্টির জলে নোনা ধরিয়া এইবার মরো-মরো পড়ি করিতেছে। বুড়া অথর্ব্ব গরু যেমন করিয়া গমাজ বুড়া এবাড়ীটাও তেম্‌নি করিয়া এখনও পর্য্যন্ত ভাড়া টা বিবাহ

জামাতা বাবাজীউ

বাড়ীর যিনি মালিক, তিনি জানিতেন, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া লোকই মরুক্, আর ছাত ফাটিয়া জলই পড়ুক বাড়ীটা মেরামত করিয়া অনর্থক টাকা খরচ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভাড়া চলিবেই কারণ, যে কয়েকজন অফিসের কেরাণী সেখানে মেস্ করিয়াছে, ভাড়া বাড়িবার ভয়ে, মেরামতের তাগিদ্ তাহাদের নিকট হইতে আসিবে না। নূতন ভাল বাড়ী খোঁজ করিয়া উঠিয়া যাইবার উত্তম এবং অবসর তাহাদের নাই, সুতরাং ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াইয়া দিলেও যে তাহারা কেহ যাইতে চাহিবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

আগাছার জঙ্গলে ভর্ত্তি নোংরা উঠানের মাঝে একটা জলের কল। কলের নীচে ইট দিয়া যে অপরিমিত স্থানটুকু বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও আবার মান্ধাতার আমল হইতে জল পড়িয়া-পড়িয়া গর্ত্তের মত হইয়া গিয়াছে। ভাঙা শ্যাওলা-ধরা সবুজরঙ্গের চৌবাচ্চাটার ফাটল বাহিয়া একটা ছোট অশ্বত্থ গাছ দিনে-দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। পাশেই নর্দ্দমা,—যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। অনতিদূরে রান্নাঘর এবং তৎসংলগ্ন খাবার ঘর। রান্নাঘরের অপর্য্যাপ্ত ঝুল ও কালীর মধ্যে অন্ততঃ চার-দুইতিন আরসলা সপরিবারে বাস করে। সেই ঘরে দিনের বেলা কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া একজন উৎকল ব্রাহ্মণ রান্না করিতেছিলেন।

রবিবার। কেহ কলতলার আশেপাশে আবার

কেহবা রান্নাঘরের দোরে কএকটা ইটের উপর বসিয়া, কলে জল থাকিতে-থাকিতে ময়লা কাপড়-জামায় প্রাণপণে সাবান ঘষিয়া লইতেছিল। দু'চার জন স্নান সারিয়া আহারের তাগিদে নীচে নামিয়া আসিল।

ভাঙা সিঁড়ির উপর ভবতোষ চাটুজ্যের পায়ের খড়মের শব্দ হইল। ভদ্রলোকের একটুখানি পরিচয়ের আবশ্যক। তাঁহাকে ঠিক প্রৌঢ়ও বলা চলে না, আবার ঠিক লোলচর্ম্ম বৃদ্ধও তিনি নন্। নিতান্ত কদাকার চেহারা, চুলগুলা এখনও সব পাকে নাই, কিন্তু দাঁতগুলা পড়িয়া গেছে। এই কলিকাতার কোন্ একটা সওদাগরী আফিসে মোটামাহিনার চাকুরি করেন,—কিছু-কিছু উপরি পাওনাও আছে। সে-আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এই পোড়ো বাড়ীটা আবিষ্কার করিয়া সস্তাদরে একটা হোটেল খুলিয়া বসেন। এখন তাঁহার শক্তি সামর্থ্যের অভাবেই হোক কিংবা অন্য-কোনও কারণেই হোক সম্প্রতি সেটা মেস্ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে কেহ এখান হইতে নড়াইতে পারে নাই। জীবনে তিনি রোজগার করিয়াছেন যথেষ্ট, কিন্তু আয়ের পাশেই ব্যয়ের যে সুবৃহৎ ছিদ্রটি তিনি নিজের হাতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বনাশা ফুটা দিয়া তাঁহার বুকের রক্তে জমানো টাকাগুলি নিঃশেষে নির্গত হইয়া গিয়াছে—তাই আজ বুড়া বয়সে সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। বিবাহ

করিয়াছিলেন পাঁচ বার, দুঃখের বিষয়, পাঁচজনেই এখন স্বর্গীয়া ; কিন্তু তাঁহারা পাঁচটিতে মিলিয়া একজোটে ধর্ম্মঘট করিয়া যেন এই বুড়াকে জব্দ করিবার জন্যই চতুর্দ্দশটি পুত্রকন্যা উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে মেয়ে দশটি। ভগবানের কৃপায় তিনটি মরিয়াছিল ; বাকী সাতটিকে পাত্রস্থা করিতেই তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। চারিটি মেয়ে আবার বিবাহের বছর দুই পরে ছেলেমেয়ে লইয়া বিধবা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ভাবিয়াছিলেন, ছেলেগুলা মানুষ হইয়া যাহা হউক একটা-কিছু করিবে ; কিন্তু তিনটির আশা-ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন,—এখন সর্ব্বকনিষ্ঠ, রতনমণির যদি কিছু আশা থাকে, তবেই···। গ্রামের স্কুলের ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি পড়িয়া তাহার বদ্‌খেয়াল ধরিয়াছিল ; তাই বছর দুই হইল, ছেলেটাকে নিজের অফিসেই শিক্ষানবিশীতে ঢুকাইয়া দিয়া এইখানেই আনিয়া রাখিয়াছেন। গত বৎসর রতনমণির বিবাহ কার্য্যটিও সমাধা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা দিয়া কন্যাদায়ের সে ঋণ তিনি পরিশোধ করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা হইয়া উঠে নাই ; এবং এই প্রসঙ্গে দেনাপাওনার হাঙ্গামায় পড়িয়া নূতন বৈবাহিকের সহিত একটা ঝগড়ার সূত্রপাতও হইয়াছে। তাই সে ছোটলোকের কন্যাকে গ্রহণ করিবেন কি না এই লইয়া সম্প্রতি তিনি বিস্তর চিন্তা করিতেছেন।

যাহাই করুন অন্ধকার সিঁড়িটা দেওয়াল ধরিয়া কোনরকমে পার হইয়া আসিয়া উঠানে পা দিতেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া রতনমণি আপন-মনে গান করিতে-করিতে তাহার জামা-কাপড়ে সাবান ঘষিতেছে।

গলাটা একটুখানি পরিষ্কার করিয়া লই.। ভবতোষ ডাকিলেন, রতন!

সহসা রতনের গান বন্ধ হইয়া গেল। পিছন ফিরিয়া বলিল, কি!

—বলি হারে ছোঁড়া, এমন করে' চুল কাটতে তোকে কে বল্লে?

—কই, কেমন করে'? এমনি • সবাই কাটে। বলিয়া তাহার মাথার পিছনে ক্ষুরবুলান চামড়াটার উপর রতন একবার হাত বুলাইয়া দেখিল।

—ছঁঃ! কাটে! বলিয়া ভবতোষ রান্নাঘরের দরজায় উঠিয়া কহিলেন, আমার বালিশের ওয়াড় দুটো এনেছিস?

—হ্যাঁ, হোই মেলে' দিয়েছি। বলিয়া উঠানের একটা ঝোঁপের দিকে রতন তাহার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দিল।

অন্ধকার রান্নাঘরের কোণের দিকে কাঠের পিঁড়ির উপর ঠাসাঠাসি করিয়া যে কয়জন খাইতে বসিয়াছিল, ভবতোষ তাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কে রে চন্দ্রকান্ত রয়েছ নাকি

আমাদের ? চল তাহ'লে আজ ছুটির বাজারে পাশায় একহাত বসা যাক্‌গে।

চন্দ্রকান্ত যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পাৎলা ছিপছিপে, বেশ রসিক লোক। ভাতের গ্রাসটা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া একগাল হাসিয়া কহিল, হে হেঁ দাদা, আমরা ত অল্‌ওয়েজ্‌ রেডি।

ঠাকুর ভাতের থালাটা ভবতোষের সম্মুখে নামাইয়া দিতেই তিনি সেই আহার্য্যের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আলু এত কম কেন হে ঠাকুর ?

কোণের দিকে একটি ছোক্‌রা বলিয়া উঠিল, ঝি-এর দ্বারা 'পটেটো ষ্টিলিং' চল্‌ছে বোধ হয়।

চন্দ্রকান্ত আর থাকিতে পারিল না—গম্ভীরভাবে বলিল, কেন, সে বুড়ি-বেটা কি জানে না,—টু ষ্টীল্‌ ইজ্‌ সিন্‌ এণ্ড এ ক্রাইম্‌ ?—স্থাখ্‌ ঝি, আর যা-ই কর না কেন বাপু, নিজের 'ক্যারেক্‌টার' ঠিক্‌ রাখ্‌বে।

ঝি ভবতোষকে জল দিতে আসিয়া চন্দ্রকান্তের মুখের পানে বিস্মিতভাবে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছ বাবু, বুঝ্‌তে পারছি নি—

চন্দ্রকান্ত তেম্‌নি গম্ভীরভাবে বলিল, হেঁ হে বুঝ্‌বে, বাবা। বল্‌ছি বর্ষাকাল আস্‌ছে, জলের কলসী ছুটো ঢাকা দিয়ে রেখো, নইলে ব্যাং ট্যাং লাফিয়ে পড়্‌বে—বুঝ্‌লে এবার ?

বেশ বাবু—বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সমবেত সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রতনমণির কাছে বসিয়া তাহার সমবয়সী একজন ছোক্‌রা কাপড়ে সাবান দিতেছিল। তাহারা দুজনে পাশাপাশি এক-ঘরেই থাকে। রতনমণি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বুড়োর ফোক্‌লা দাঁতের হাসি শুনেছিস্? যাবার বেলা ত' আমায় খুব একচোট্ নিয়ে গেলেন,—এদিকে রসিকতা দেখ বুড়োর। কেন, এই ত আজকালকার ফাশান্,—না, কি বল্ খগেন্?

খগেন তাহার হাতের সাবানটা কাপড়ের উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল, বুড়োরা বুড়োর মতই থাক্ না রে বাবা, আমাদের সঙ্গে কি বটে তোদের!

রতনমণি বলিল, চল্ না খগেন, ওরা ত পাশাখেলায় মাত্‌বে, আমাদেরও একবাজি তাস্ নিয়ে বসা যাক্।

খগেন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, বাই নো মিন্স্। বৌএর চিঠি এসে পড়ে' আছে আজ সাতদিন,—'রিপ্লাই' না দিলে আর চলছে না।

রতনমণি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জামাটা কাচিতে কাচিতে গুন্‌-গুন্ করিয়া কি একটা থিয়াটারী-গানের সুর ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিল।

আহারাদির পর উপরের একটা ভাঙা ঘরে চূণ সুর্‌কির

জামাতা বাবাজীউ

চটা ছাড়ানো ধুলায়-ভর্তি মেঝের উপর একটা মাদুর বিছাইয়া ভবতোষদের পাশাখেলা আরম্ভ হইল এবং দেখিতে-দেখিতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই খেলায় তাঁহারা এম্‌নি মাতিয়া উঠিলেন যে, ক্ষণে-ক্ষণে তাঁহাদের হুঙ্কারের চোটে সেই ভাঙা বাড়ীটার কড়িকাঠ হইতে ভিত্তি পর্য্যন্ত এক-এক বার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খেলোয়াড়দের এত চীৎকার সত্ত্বেও কয়েকজন ছোক্‌রা তাঁহাদেরই আশে-পাশে কেহ বা শতছিন্ন মলিন বিছানার উপর আবার বিছানা ময়লা হইবার ভয়ে কেহ বা মাদুরের উপর পুরানো খবরের কাগজ বিছাইয়া তাহাদের সেই শ্রমজীর্ণ পঞ্জরাস্থি-সম্বল দেহগুলি লুটাইবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িল। একে অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, তাহাতে আবার অনেকের সংসার চলে না, কাজেই সকাল সন্ধ্যা দুইবেলা 'প্রাইভেট্ টুইশনি' আছে,...এম্‌নি করিয়া প্রত্যহ ভোর সাড়ে ছয়টায় উঠিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, শাকচচ্চড়ি খাইয়া যাহাদের কাজ করিতে হয়, সপ্তাহের মধ্যে একটা দিন তাহারা যে বাহিরের সমস্ত শব্দ-কোলাহল উপেক্ষা করিয়া এম্‌নি করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

খগেনের নূতন বিবাহ হইয়াছিল। বৌকে একুশপৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুবৃহৎ শোকোচ্ছ্বসিত ব্রজকাব্য লিখিয়া সে যখন চিঠিখানি ডাকে দিয়া ফিরিয়া আসিল, বেলা তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেছে।

অতসী

অন্ধকার সিঁড়ির একপাশে পেরেক্-আঁটা পুরাতন একটি বিস্কুটের টিন্ বহুকাল হইতে এই বাড়ীর 'লেটার বক্সের' কাজ করিতেছে। খগেন যতবার উপর-নীচে উঠা-নামা করিত, কিছু থাকুক আর না থাকুক, এই চিঠির বাক্সটা একবার নাড়িয়া দেখা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিবার সময় টিন্‌টা হাত্‌ড়াইতে গিয়া দেখিল, পিয়ন কোন্ সময়ে একটা পোষ্ট-কার্ডের চিঠি দিয়া গিয়াছে। কাহার চিঠি, অন্ধকারে নামটা ভাল পড়া গেল না, খগেন চিঠিখানা হাতে লইয়া উপরে আলোতে আসিয়া দেখিল, রতনমণির নাম লেখা। চিঠির মালিককে খুঁজিতে বিশেষ দেরি হইল না। অনতিদূরে সে তখন ময়লা জলের 'ট্যাঙ্কের' উপর বসিয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া মিহিসুরে গান ধরিয়াছে, এবং গানের মাত্রা ও তালের সঙ্গে-সঙ্গে জল-ভর্ত্তি সেই টবটার উপরেই বাঁয়া তবলার কাজ চলিতেছে।

খগেন পোষ্টকার্ডখানা তাহার দিকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল, রতন, এই ত্যাখ্, তোর চিঠি।

রতনমণি ভাবিল, তাহার কাজে বাধা দিয়া এখান হইতে তাহাকে নামাইবার জন্যই খগেন এ দুষ্টুমি করিতেছে। গম্ভীরভাবে বলিল, কে দিয়েছে বল্ ত দেখি?

খগেন পড়িয়া বলিল, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখ্‌ছে।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইল না। রতনমণি একেবারে ডিগ্‌বাজি খাইয়া মরি-পড়ি করিয়া নীচু ছাতটা হইতে ঝুপ্‌ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খগেনের হাত হইতে চিঠিখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আমার 'ফাদার্‌-ইন্‌-ল' লিখ্‌ছে।

রতনমণি মনে-মনে এক নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল। শ্বশুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

শ্রীমান্ রতনমণি,নীরাপৎ দীর্ঘকালজিবীতেসু—পরম শুভাশির্ব্বাদ বিশেষঞ্চ—

বাবাজীউ, আগত ১৫ই তারিখে ৺জামাতা ষষ্ঠীর দিবসে তোমাকে আনিতে পাঠাইবার লোক পাইলাম না,সেই জন্য কাহাকেও পাঠাইতে পারিলাম না এবং তৎকারণবশতঃ এই পত্র লিখি বাবাজীবন উক্ত তারিখে এখানে আসিতে কোন রকম অন্যথা করিও না। আমার রেলের চাক্‌রিতে কামাই করিবার যো নাই, নচেৎ আমি নীজে যাইয়া তোমাকে সমবিহারে লইয়া আসিতাম। বাবা যাহা হউক, সেকারণে কিছু মনে করিও না। বাবাজী না আসিলে আমার মনস্তাপের অবধী রইবে না। বৈবাহিক মহাশয়কেও অত্র পত্রে নিবেদন করিলাম। আলাদা চিঠিও দিলাম। অত্রস্থ শুভ। ইতি, আঃ—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অত্র পত্রে বৈবাহিক মহাশয় আমার নমস্কার জানীবেন। আগত

জামাই ষষ্ঠীতে শ্রীমান্ রতনমণি বাবাজীবনকে অতি অবশ্য একবার এ-বাটী পাঠাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়। আমি শুভবিবাহের সময় যাহা যাহা অঙ্গিকার করিয়া বাবাজীকে দিতে অক্ষম হইয়াছি, এই কালিন তাহাকে এই বাটী পাঠাইয়া দিলেই সমস্ত চুকাইয়া দিব জানীবেন। এ-বাটীস্থ সমস্তই মঙ্গল। আপনাদের কুশল সমাচারদানে পরম সুখি করিবেন ইতি।

ভাঙাহাতের লেখা এই নীরস চিঠিখানি পড়িয়াও রতনমণির আনন্দের আর সীমা রহিল না। মনে হইল, পথ চলিতে-চলিতে যেন কোন্-একটা বন্ধ-করা চলন্ত গাড়ীর ফাঁকে হঠাৎ কোন্-এক অনিন্দ্য সুন্দরীর মুখখানি একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লইল। অফিসের বড় সাহেব যেন খুসী হইয়া তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিলেন।

হাসিতে হাসিতে রতনমণি বলিল, আমি ত প্রিপেয়ার্ড্ হ'য়েই আছি ভাই, এইবার 'ফাদারের' মত হ'লেই হয়। তা, তুই একটি কাজ কর্ না ভাই খগেন, বাবার হাতে এই চিঠিখানা দিগে যা; মানে কথা হচ্ছে, আমি যেন এ 'লেটার্'-খানা এখনও দেখিনি, এই ভাব আর কি, বুঝ্‌লি? পড়ে' কি বলে, শুনে' আসিস্। এই বলিয়া চিঠিখানি খগেনের হাতে দিয়া রতনমণি তাহার ঘরে ঢুকিয়া আয়না চিরুণী লইয়া চুল আঁচ্‌ড়াইতে বসিল।

পাশাখেলা তখনও পুরাদমেই চলিতেছিল। খগেন ধীরে ধীরে

পোষ্টকার্ড্‌খানি ভবতোষের হাতে দিতেই তিনি একবার মুখ তুলিয়া বলিলেন, কে দিলে ?

—লেটার-বক্সে ছিল।

—ও। বলিয়া তাঁহার বামহস্তধৃত খেলো হুঁকায় একবার কটাক্ষ-পাত করিয়াই পায়ের নীচে চাপা দিয়া রাখিয়া পাশাগুলা তিনি কুড়াইয়া লইলেন এবং সেগুলা কিয়ৎক্ষণ হাতের মধ্যেই খট্ খট্ করিয়া সে এক অদ্ভুত কৌশলে মাদুরের উপর হাতের পাশা-তিনটা ছুঁড়িয়া দিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ছ'তিন্ নয় মারো ত' বাবা একবার।

ভবতোষ একান্ত মনোনিবেশ-সহকারে গুটি বসাইতে লাগিলেন। এইবার চন্দ্রকান্তর পালা। তাহার উভয় করতলের মধ্যে আবার পাশার খট্‌খটানি সুরু হইল। দেখিতে-দেখিতে তাহার সেই গির্-গিটির মত দেহের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা খিঁচিয়া, ভাঁটার মত তাহার সেই বড় বড় চক্ষুদুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া, হাতের পাশা-গুলা ছুঁড়িয়া দিয়া সেও চেঁচাইয়া উঠিল, পড়ে' যা একটা পনেরো বেশ লম্বা করে'—

সত্যই পনেরো পড়িয়া গেল। আনন্দাতিশয্যে চন্দ্রকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধেই-ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। 'কেয়াবাৎ', 'কেয়াবাৎ' বলিয়া আবার সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

খগেন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িল।

রতনমণি আগ্রহের সহিত তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, কি বল্‌লে রে?

খগেন বলিল, পড়্‌লেই না ত' আর কি বল্‌বে ছাই!

—পড়্‌লে না? একবার উল্‌টেও দেখ্‌লে না?

—হাঁ, দেখে'ই চেপে' রাখ্‌লে। খেলায় মেতে উঠেছে, এখন কি আর পড়্‌বার অবসর আছে তার?

রতনমণি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা চিঠিখানা যখন সে দেখ্‌লে, তখন তার মনের ভাবটা কিরকম বুঝ্‌লি? হাসি হাসি না রাগ-রাগ?

বিরক্ত হইয়া খগেন বলিয়া উঠিল, অত সব জানিনে বাবু, তুই দেখে' আয়গে যা—

রতনমণি তাহার পিতার উদ্দেশে এইবার দাঁত কটমট করিয়া, বলিতে লাগিল, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু খেলা আর খেলা। ষ্টুপিড্ কোথাকার! নন্‌সেন্স···

২

অবশেষে পাওনার লোভে ভবতোষ রাজি হইলেন। কিন্তু কেরাণীর শুধু বাপ রাজি হইলেই চলে না, তাহার উপরেও আর-

একজনকে রাজি করিতে হয়,—তিনি অফিসের বড়বাবু। দুপুর রৌদ্রে রতনমণি সেদিন আর তাহার প্রতিদিনের অভ্যাসমত হাঁটিয়া অফিসে যাইতে পারিল না, ভবানীপুর হইতে হাইকোর্টের একটা ট্রামে চড়িয়া নগদ দুইআনা পয়সার একটা ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট কিনিয়া বসিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অনেক অনুনয়-বিনয়, অনেক খোসামুদির পরে বড়বাবু বলিলেন, চার দিনের ছুটি ত' হ'তেই পারে না,—মেরে'-কেটে দুটো দিন দেওয়া যেতে পারে। রতনমণি ভাবিয়া আকুল হইল। সুদূর বিহারের একটা ছোট ষ্টেশনে তাহাকে যাইতে হইবে। শ্বশুর ষ্টেশন-মাষ্টার,—সেই খানেই বাস করেন। হাওড়া ষ্টেশনে রাত্রের ট্রেণে চড়িলে পরদিন সন্ধ্যায় সেখানে গিয়া পৌঁছিবে। আবার ফিরিবার সময়েও তাই। সেদিন সোমবার। রতন আঙুল গণিয়া দেখিল, আজ অফিস করিয়া রাত্রে যদি ট্রেণে চড়া যায়, মঙ্গলবারের ছুটির দিনটা পথেই কাটিয়া যাইবে। রাত্রিটা সেখানে বাস করিয়া আবার বুধবার সকালে ট্রেণে চড়িয়া বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আসিয়া অফিস করিতে পারিবে। মোটে একটা রাত্রি। আচ্ছা, তা-ই তা-ই!

সমস্তদিনের ভুখা ভিখারী দাতার কাছে হাত পাতিয়া যেমন আধলা কি সিকি-পয়সার বিচার করিতে পারে না, যাহা পায় তাহাই মাথায় তুলিয়া লয়,—রতনমণিও তেমনি আজ একটি

রাত্রির ছুটি পাইয়া অফিসে ছুটি হইবার কিছু আগেই ছুটিতে-ছুটিতে প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহাদের সেই ভাঙা মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও অফিস হইতে বাবুরা কেহই ফিরে নাই। দরজার তালা খুলিয়া রতনমণি ঘরে ঢুকিয়াই সদ্যিক্ষণের পাঁঠার মতই থরথর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে কি যে করিতে হইবে, কেমন করিয়া যে সে এই মহাযাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবে, তাহা সে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—মাথার ভিতর কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গেল। ভবতোষ আজ সকাল-বেলায় একটা টাইম্‌টেব্‌ল দেখিয়া তাহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছেন। রাত্রি নয়টার সময় ট্রেণ,—সুতরাং সময় অনেক; এখন হইতে এত-বেশী ব্যস্ত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই, এই কথাটা সে মনে-মনে বহুবার আলোচনা করিয়া একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইল। তবে একটা কাজ বাবুরা আসিবার পূর্ব্বেই তাহাকে সমাধা করিয়া রাখিতে হইবে। সেটা এমন বিশেষ কিছুই নয়। মুরারী-বাবুর চৌকির তলায় জুতার কালী আছে, তাহাই একটুখানি চুরি করিয়া লইয়া জুতা জোড়াটা ঠিক করিয়া লওয়া। রতনমণি তৎক্ষণাৎ তাহার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেলিল এবং মিনিট কয়েকের মধ্যেই কার্য্যটা সমাধা করিয়া দিয়া তাহার তালি-দেওয়া ছেঁড়া জুতাটার সৌন্দর্য্য না ফিরাইতে পারিলেও অন্ততঃ তাহার বর্ণটা ফিরাইয়া লইল। কাপড় জামা সে গতকল্য পরিষ্কার করিয়াছে,—এইবার পিতার নিকট হইতে ট্রেণভাড়ার

টাকাগুলি আদায় করিতে পারিলেই নিশ্চিন্তমনে ষ্টেশনে চলিয়া যাইতে পারে। ততক্ষণ খগেনের আর্শী চিরুণী লইয়া সে তাহার মাথার অবাধ্য চুলগুলাকে প্রাণপণ শক্তিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অফিস হইতে দু'একজন বাবু আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার বাবা তখনও আসিতেছে না দেখিয়া রতনমণি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বুড়া যদি আজ পয়সা বাঁচাইবার জন্য ট্রামে না চড়িয়া লাঠি ধরিয়া তাহার গ্রামভারী চালে' হাঁটিতে সুরু করিয়া থাকে, তাহা হইলেই ত' সে গিয়াছে···দেখিতে-দেখিতে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল,—রতনও চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, রাগে দুঃখে এইবার তাহার কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল। হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া মরিবার ভয়ে গলির দিকের যে ঝোলা বারান্দাটার উপর অতিবড় দুঃসাহসীও কোনদিন পা দিতে সাহস করিত না, আজ দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া রতনমণি বারে-বারে তাহারই উপর ছুটিয়া গিয়া গলির মোড় পর্য্যন্ত এক-একবার দেখিয়া আসিতে লাগিল।

ভবতোষ হাঁটিয়াই আসিলেন। রাত্রি তখন সাতটা বাজিয়াছে। বলিলেন, হাঁরে চারটি খেয়ে গেলে হ'ত না রতন? আজ সারারাত আবার কাল সারাটা দিন! কিন্তু ঠাকুর ত এখনও আসেনি দেখ্ছি· –

কিন্তু পেটের ক্ষুধার চেয়ে আর-একটা প্রবল ক্ষুধার তাড়নায়

রতনমণির তখন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না, বলিল, তা হ'লে কি আর ট্রেণ ধর্‌তে পার্‌ব, বাবা? তার চেয়ে ষ্টেশনেই যা হোক কিছু—

ভবতোষ ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন, বেজেছে ত সাতটা, দেখে' এলাম ঐ দোকানের ঘড়িতে। উনোন ধরে' গেছে, ঠাকুরও এল বলে'।

রতনমণি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কোথায় দেখে' এলে সাতটা বেজেছে? ওই বিড়িওয়ালার দোকানে? ও বেটা ঘড়িতে দম্-টম্ দেয় কখনও? ওটা ঘড়ি নয়, ঘোড়া! এখন আটটা ত বেজেইছে, বরং বেশী ত কম নয়।

মেসে কাহারও ঘড়ির বালাই ছিল না। সকাল হইতে অফিস যাইবার সময়টুকু পর্য্যন্ত মেসের বাবুরা আন্দাজি ঠিক কয়টা বাজিয়া কয় মিনিট হইল বলিয়া দিতে পারে, কিন্তু অফিস ছুটীর পর তাহাদের সে অলৌকিক শক্তিটুকু আর থাকে না; সুতরাং এখন আর সময় লইয়া বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া ভবতোষ পুত্রের শুধু যাইবার ট্রেণ ভাড়া পাঁচ টাকা বারো আনা এবং রাহা-খরচ-বাবদ সর্ব্বসমেত আটটি টাকা দিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, পকেটে টাকাকড়ি রাখিস্‌নে বাপু, জানিস্ ত' সে-বারে সেই বাড়ী থেকে আস্‌বার সময়, এই হাবড়া ইষ্টিশনেই পকেট থেকে সাড়ে তিনটা টাকা আমার কোন্ গোলমালে ফস্ করে' কে তুলে' নিলে টেরই পেলাম না।...আর হাঁ, ভালো কথা মনে পড়্‌ল, শোন্,—বলিয়া

রতনকে তিনি একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, কহিলেন, লিখেছে যখন, চেন-ঘড়িটা ত' দেবেই, আর সেই পণের দরুন্ গোটা ষাটেক টাকা এখনও পাওনা রয়েছে, তোর যাওয়া-আসা ইন্টার ক্লাশের ভাড়াটাও আদায় করে' নিস্—মোটের মাথায়, শ' খানেকের কম যেন ফিরিস্‌নে বাপু,—বুঝ্‌লি ?

সে-সব বুঝিবার মত মনের অবস্থা রতনমণির তখন ছিল না। কোন রকমে ঘাড় নাড়িয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া ছুটিতে-ছুটিতে ট্রামে গিয়া চড়িল এবং আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ইহাকে-উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া টিকিট কিনিয়া ছুটাছুটি ধস্তাধস্তি করিয়া অতিরিক্ত-রকমে নাকাল হইয়া সে যখন ট্রেণের থার্ড্ ক্লাশের একটা বেঞ্চির উপর চাপিয়া বসিল, তখন তাহার মনে হইল, এইবার যেখানে হোক চলিল বটে। বাণ্ডিল-দুই বিড়ি পথের জন্য এবং সস্তাদরের এক বাক্স হাওয়াগাড়ী-মার্কা সিগারেট্ শ্বশুর-বাড়ীর জন্য সে কলিকাতা হইতেই কিনিয়া আনিয়াছিল। পয়সা দুই-এর পান কিনিতে গিয়া তাহার যে আহারাদি কিছুই হয় নাই সে-কথাটা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু এ-সময় মনে হইলে বা কি হইবে ? সে যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে, গাড়ী আসিয়া প্ল্যাটফর্মে লাগিতে তখন ঘণ্টা খানেক দেরী ছিল। এই সময়ের মধ্যে অনায়াসে সে কিছু লুচি মিষ্টি খাইয়া লইতে পারিত, কিন্তু ওই

হিন্দুস্থানী মেয়েটাই তাহার সব মাটি করিয়া দিল। অনর্থক তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এমন করিয়া ওই ওয়েটিংরুমের পাশে বসিয়া থাকা তাহার ভালো হয় নাই। সে যে কোথায় গিয়া কোন্ গাড়ীতে চড়িয়া বসিল, ভিড়ের মাঝে ছাই দেখাও গেল না।...

ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, চাই চিনাবাদাম!

রতনমণি তাহাই চার পয়সার কিনিয়া ফেলিল। আশিল, বর্দ্ধমান কিংবা অণ্ডালে এক পেয়ালা চা এবং কিছু মিষ্টি খাইয়া লইলেই চলিবে! গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তৃতীয় শ্রেণীর সস্তা যাত্রীর বন্তার ঠেলাঠেলির চোটে এক কোণে জড়পুঁটুলি হইয়া রতনমণি যে পরম সুখকর চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়িল, সে-কথা না বলাই ভালো। যাহাই হউক, সহধর্ম্মিণীর কোষ্ঠী চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার পেটের চিন্তাও চলিতে লাগিল। এক-একটি করিয়া বাদাম ছাড়াইয়া কোনবার খোসার পরিবর্ত্তে বাদাম, আবার কখনও বা বাদামের পরিবর্ত্তে খোসা মুখে দিয়া চিবাইতে-চিবাইতে ক্ষণে-ক্ষণে তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন এই তিন নম্বরের কুলি-গাড়ী ছাড়িয়া কোথায় কোন-একটি সুসজ্জিত বাড়ীর ভিতর প্রিয়তমার রূপসুধা গোগ্রাসে গিলিবার চেষ্টা করিতেছে।

যাহা হউক, স্বপ্ন তাহার আংশিক সত্যে পরিণত হইল, তাহার পরের দিন। সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন সমস্ত দিনের বেলাটা কোন রকমে কাটাইয়া দিয়া রতনমণি যখন সেই ইস্‌মাইলপুরের ছোট

জামাতা বাবাজীউ

ষ্টেশনে আসিয়া নামিল, সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। ট্রেণ হইতে নামিয়াই প্ল্যাট্‌ফরমের অন্ধকারে সে একবার তাহার কোঁচার খুঁট দিয়া জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইল। তাহার পর মুখখানি একবার ঘষিয়া লইয়া সেইখানেই মিনিটকয়েক চুপ করিয়া দাঁড়াইল। পাঁচ-ছয় জন হিন্দুস্থানী যাত্রী লোটা-কম্বল লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। জনচুই লোক, গাড়ীতে চড়িবার জন্য ট্রেণ আসিবার পূর্ব্ব হইতেই প্ল্যাট্‌ফরমের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল। অদূরে একটা মিট্‌মিটে কেরোসিনের 'ল্যাম্প-পোষ্টের' কাছে দাঁড়াইয়া ধুতি-পরা একজন ভদ্রলোক মাথায় কালোরঙের একটা টুপি পড়িয়া টিকিট আদায় করিতেছিলেন। অন্ধকারে হয়ত কোনও আসামী টিকিট না দিয়াই তার ডিঙাইয়া ভাগিয়া পড়িবার মতলব করিতেছে ভাবিয়া রতনমণির দিকে তাকাইয়া তিনি গম্ভীর কণ্ঠে হাকিয়া উঠিলেন, এয়্ তোম্ উধার্‌মে মৎ যাও।

গলার আওয়াজ শুনিয়া এবং চেহারা দেখিয়া রতনমণি এইবার তাহার শ্বশুর মহাশয়কে বেশ চিনিতে পারিল। কাছে আসিয়া একটি প্রণাম করিতেই নিকুঞ্জবিহারী আনন্দাতিশয্যে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন; বিনা-টিকিটের আসামী ভাবিয়া এখনই যে কি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিলেন তাহার ঠিক্ নাই,—সেজন্য তিনি একটুখানি অপ্রস্তত হইয়াই তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন, এস, বাবাজী, এস, এস। আমি ত' ভাব্‌লাম বুঝি

বা,—বেশ, বেশ, বাড়ীর সব মঙ্গল ত? দেখ্‌ছ ত' বাবা, আমার এই কাজ, একদণ্ড ছুটি পাবার উপায় নেই। আমিই যেতাম, নিজে গিয়ে নিয়ে আস্‌ব ভেবেছিলাম, কিন্তু—আরে শুক্‌দেউ! না, থাক্ থাক্ আমিই যাচ্ছি। এস বাবা রতন। বলিয়া ষ্টেশনের গোল-কাঁচ-দেওয়া বাতিটা হাতে লইয়া তিনি বাসার দিকে চলিতে লাগিলেন।

লাল কাঁকরের রাস্তার পাশেই 'রেলওয়ে কোয়ার্টার',—ষ্টেশন হইতে বেশী দূরে নয়।

দরজার কড়া নাড়িয়া নিকুঞ্জবিহারী তাঁহার বড়ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, হরিপদ! হরিপদ!

তিন-ভাই-বোনে ঝগড়া করিতেছিল। এমন অসময়ে পিতার ডাক শুনিয়া তাহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হঠাৎ থামিয়া গেল। হরিপদ খুব জোরে-জোরে জ্যামিতি মুখস্থ করিতে লাগিল,—ক খ সরল রেখাকে যদি সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতে হয় তাহা হইলে--এঁ্যা, এঁ্যা—উঁ

শ্যামাপদ তাহার ছোট। দাদাকে টেক্কা দিয়া গিড়গিলায় সেও চেঁচাইয়া উঠিল, মূষিক-ব্যাঘ্র। বয়ে য ফলা আকার, ঘয়ে র-ফলা,—ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র। মহাতপা নামে এক মুনি ছিলেন। একদিন তাঁহার আশ্রমের নিকট একটা কাক একটা ছোট ইন্দুর ধরিয়াছিল।

জামাতা বাবাজীউ

নিকুঞ্জবিহারী আবার ডাকিলেন, শুনতে পাচ্ছিস্‌নে হরে !

শুনতে পাবে কেন ? দাঁড়াও তোমাদের দুষ্টুমি বার করছি। বাবা !—বলিয়া তাঁহার কন্যা প্রভাবতী ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু দরজা খুলিয়াই বেচারা এমন বিপদে পড়িয়া গেল যে, না পারিল কোনও কথা বলিতে, না পারিল ছুটিয়া পলাইতে। মাথার কাপড়টা তাড়াতাড়ি টানিয়া দিয়া দরজার এক-পাশে কবাটের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া লজ্জায় সে যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। রতনমণির বুকের ভিতরটা তখন ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল।

সামান্য একটুখানি উঠানের পরেই হাত-দুই চওড়া একটি বারান্দা, তাহার পরেই থাকিবার মত পাশাপাশি দুইখানি ঘর। উঠানের বাঁদিকে আর-একটা ঘরে রান্না চলে। সোজা কথায় ইহাকেই বাঙালী ষ্টেশনমাষ্টারের 'বাংলো' কহে।

যে-ঘরে হরিপদ ও শ্যামাপদর ভয়ঙ্করভাবে পাঠাভ্যাস চলিতে-ছিল, রতনমণিকে লইয়া অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া নিকুঞ্জবিহারী সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বলিলেন, মাদুরটা ছেড়ে ওঠ্‌, ওঠ্‌, আজ আর পড়তে হবে না, ওঠ্‌,—দেখ্‌ কে এসেছে—

হরিপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া রতনমণির একটা হাতে ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, কখন্‌ এলেন জামাইবাবু ? এখ্‌খুনি ?

বিবাহের পর রতনমণি মাত্র দুইবার আসিয়া সপ্তাহখানেক

এখানে থাকিয়া গিয়াছেন, কাজেই শ্যামাপদ প্রথমে তাহাকে ভালো চিনিতে পারে নাই। এইবার চিনিতে পারিয়া বইগুলা সরাইয়া দিয়া সেও লাফাইয়া উঠিল।

—বসো বাবা, বসো।—বলিয়া রতনমণিকে সেইখানে বসাইয়া রাখিয়া নিকুঞ্জবিহারী রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, জ্বলন্ত উনানের উপর ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহারই একধারে বসিয়া প্রভাবতী নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে তরকারী কুটিতেছে। বলিলেন, ঘি, ময়দা সব আছে ত মা?

প্রভা তেম্‌নি হেঁটমুখেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

—ও কি—আমাদের ভাত চড়িয়েছিস্ নাকি?

—হ্যাঁ।

—তা বেশ, আমাদের জন্যে না হয় ভাতই হোক্। শুকদেউ-এর বৌ আসেনি?

বঁটির উপর প্রভা আর-একটা আলু কাটিতে কাটিতে ধীরে-ধীরে বলিল, এসেছিল—উনোন ধরিয়ে, জল-টল এনে' দিয়ে গেছে।

আচ্ছা, আমি আবার ডেকে' দিচ্ছি। ময়দা মেখে' লুচিগুলো বেলে-টেলে দিক। দেখিস্ মা, আজ একটু দেখে'-শুনে' রাঁধিস্—বলিয়া নিকুঞ্জবিহারী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ষ্টেশন-খালাসী শুকদেবের বাসার দিকে চলিয়া গেলেন। কুলীনের ঘরে আজ জামাই আসিয়াছে,

আজ তাঁহার আনন্দের দিন, কিন্তু কাহাকে লইয়া আনন্দ করিবেন? পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী চলিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে আনন্দ বলিতে তাঁহার যাহা-কিছু সবই ফুরাইয়াছে। মেয়েটা বড় হইয়াছে, বিবাহ দিয়াছেন, দুদিন বাদে সেও পরের বাড়ী চলিয়া যাইবে,—থাকিবে ওই ছেলে-দুটো। তাহাদের মানুষ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহার ছুটি!... হঠাৎ তাঁহার মৃতা পত্নীর মুখখানি মনে পড়িয়া গেল। সজলচক্ষু দুইটা জামার আস্তিনে মুছিয়া লইয়া তিনি শুকদেবের দরজায় গিয়া ডাকিলেন, শুকদেউ!

ডাকিবামাত্র শিকে-ঝোলানো একটা কেরোসিনের ল্যাম্প হাতে লইয়া শুকদেব ও তাহার স্ত্রী বাহির হইয়া আসিল। শুকদেব বলিল, আপনি নিজে কেন এলেন বাবু, আমরাই যাচ্ছিলাম।

শুকদেবের স্ত্রীর হাতের দিকে তাকাইয়া নিকুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার হাতে ওটা কি বৌ?

শুকদেব উত্তর দিল। বলিল, ও কিছু না বাবু, সেই বাচ্ছা পাঁঠাটা আজ কেটে দিলাম। জামাইবাবু এলেন, খাওয়াবেন কি বাবু?

নিকুঞ্জবিহারী বলিলেন, তাই ত রে শুকদেউ, মেয়েটা কি আর এত সব রাঁধতে পারবে?

শুকদেব ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্ত্রীর দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া বলিল—আমার 'বহু' যে পাকা রাঁধুনী আছে বাবু, উহি সব দেখিয়ে দিবে।

বাবুর দরজা পর্য্যন্ত তাহাদের পৌছাইয়া দিয়া শুকদেব বলিল,—আমি 'ইষ্টিশানে' যাই বাবু, ছোটবাবু এসেছেন, আপনি ঘরে থাকুন।

শুকদেব কিয়দ্দুর চলিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে নিকুঞ্জবিহারী তাহার পশ্চাতে গিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিলেন,—জামাই সেই থেকে বসে' আছে শুকদেব, এখনও জল খেতে দেওয়া হয়নি—দূর ছাই! এসব কি আর আমাদের বেটাছেলের কাজ! যা বাপু, জল্‌দি কিছু ভালো মিষ্টি ফিষ্টি—

শুকদেব উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৩

চৌদ্দ বছরের সেই মা-হারা মেয়েটাকেই সব করিতে হইল। 'বহুকে' রান্নাঘরে বসাইয়া প্রভা একসময় ঘরে গিয়া তাহার উস্কোখুস্কো মাথার চুলগুলা চিরুণী দিয়া তাড়াতাড়ি আঁচড়াইয়া লইল। কপালে একটা নূতন কাঁচ-পোকার টিপ পরিয়া তাহার

পরনের ময়লা কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। আর্‌শিতে ভালো করিয়া মুখখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, রাত্রে মেয়েদের নাকি আর্‌শি দেখিতে নাই। আর্‌শিখানা তুলিয়া রাখিয়া পুনরায় সে রান্না-ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু শাড়ীটার দিকে তাকাইতেই লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল,—এই বেশপরিবর্ত্তন তাহার বাবার নজরে পড়িলে তিনি কি ভাবিবেন!...কাজ নাই। প্রভা আবার তাহার সেই পরিত্যক্ত কাপড়ই পরিয়া লইল। পাশের ঘরে ছেলেদের সহিত রতনমণি গল্প করিতেছিল। নিকুঞ্জবিহারী পুনরায় ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

প্রভা রান্না-ঘরে ফিরিয়া আসিতেই 'বন্ধু' বলিল, একটি ভালো রঙ্গিলা শাড়ী পরে' এস দিদি, বঝলে? জামাইকে খাইয়ে দিয়ে নিজে খেয়ে নাও। নিয়ে ঘুমোতে যাও। বাবু ছেলেদের নিয়ে এর পর খাবেন।

প্রভা মুখে কিছুই বলিল না। বন্ধুর মুখের পানে তাকাইয়া ফিক্ করিয়া একবার হাসিল।

মাংস ইত্যাদি রান্না করিতেই সাড়ে-বারটা বাজিয়া গেল।

হরিপদ এক-সময়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—রান্না কখন হবে দিদি? জামাই-বাবু বলছে, আজ কি তাকে উপোষ খাওয়াবে নাকি?

জামাতা বাবাজীউ

প্রভার অত্যন্ত লজ্জা হইল। বলিল,—ফাজলমি করতে হবে না। যা দেখি, বাবাকে ডেকে' আন্।

—তা হ'লেই দেবে ত খেতে?

—হ্যাঁ।

হরিপদ তাহার বাবাকে ডাকিতে গেল। 'বউ' বারান্দার উপর আসন বিছাইয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

খাওয়া শেষ হইতেই দেড়টা বাজিল। নিকুঞ্জবিহারী রতনমণিকে লইয়া পাশের ঘরে গিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। চাকরি, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই তিনি তাহাকে করিতেছিলেন। প্রশ্নের উত্তর দিবে কি, রতনমণি তখন ছট্‌ফট করিতেছিল।

প্রভা নিজে খাইল। 'বউ'কে খাওয়াইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ঘুমের ঘোরে এইবার তাহার চোখ দুইটা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। চোখে জল দিয়া ঘুম ছাড়াইয়া নিজের হাতেই বিছানা পাতিল। অবসন্ন শরীরটা তাহার যেন বিশ্রামের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। যতবার ঘুম আসে, চোখ দুইটা রগড়াইয়া ততবার সে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পোড়া ঘুম যেন আজ তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছিল না। যে শাড়ীখানা একবার পড়িয়া লজ্জায় সে খুলিয়া রাখিয়াছিল, এইবার সেখানা ভালো করিয়া পরিল। তাহার পর, বিছানার এক পাশে আনন্দ ও লজ্জায় চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া ঢুলিতে

ঢুলিতে কোন্-একসময় বালিশের পাশে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিকুঞ্জবিহারী বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া আসিয়া ছেলে-দুটিকে লইয়া সেই ঘরেই মাদুরের উপর শয়ন করিলেন।

রতনমণি অনেক রাত্রে তাঁহার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া বসিল। দেখিল, প্রভা বিছানার এক পাশে শুইয়া আছে। ইহা তাহার কপট নিদ্রা ভাবিয়া প্রথমে তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল না। আহারাদির পর বিড়ি-সিগারেট না টানিতে পাইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার পেট ফাঁপিতেছিল, এইবার পকেট হইতে একটা গাওয়াগাড়ী সিগারেট বাহির করিয়া চোঁ-চোঁ করিয়া টানিতে টানিতে সস্তা তামাকের বিকট গন্ধে ও ধোঁয়ায় সারা ঘরটা একেবারে মশ্‌গুল করিয়া ফেলিল।

এইবার প্রভাকে উঠাইবার পালা। প্রথমে ধীরে, পরে জোরে জোরে বারকতক নাড়া দিয়া রতনমণি বুঝিল নিদ্রা তাহার কপট নয়, সত্যই সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বহুদিন পরে যাহার স্বামী আসিয়াছে, সে মেয়ে যে কেন ঘুমায় এবং ঘুমাইলেও বা ডাকিলে উঠে না কেন, এই কথাটা সে কোনপ্রকারেই বুঝিতে পারিতেছিল না। ঘুমন্ত প্রভার গায়ে সুড়্‌সুড়ি দিয়া আদর করিয়া মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেও যখন তাহাকে উঠাইতে পারিল না, রতনমণি তখন রাগিয়া উঠিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে সুরু

রিল। বেশী জোরে-জোরে কিছু করাও যায় না, পাশের ঘরে শ্বশুর-মহাশয় আছেন,—তাহার লজ্জাও করিতেছিল। অবশেষে সে একবার জোর করিয়া বিছানার উপর তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ঘুমের ঘোরে প্রভা এম্‌নি জোরে কাঁই-মাঁই করিয়া উঠিল যে, ভয়ে লজ্জায় রতন তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। আলোটা নিভাইয়া দিয়া সে এইবার রাগ করিয়া নিজে একপাশে শুইয়া পড়িল। মনে-মনে সে এই অসভ্য ঘুমন্ত মেয়েটার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিতে লাগিল, অনেক গর্হিত অপবাদ দিতে লাগিল, অথচ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইতেও পারিল না। ঘুম ভাঙাইবার যতপ্রকার কৌশল তাহার জানা ছিল, একে একে প্রভার উপর সে গুলি সমস্তই প্রয়োগ করিতে কসুর করিল না, কিন্তু এই এত রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম করিয়া প্রভার পরিশ্রান্ত দেহ-মন গাঢ় নিদ্রায় এত বেশী অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দেহের উপর কোনপ্রকারের অত্যাচার সে টের পাইল না।

রাত্রির শেষ-প্রহরে প্রভা হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। চোখ খুলিয়া দেখিল, পার্শ্বে তাহার স্বামী তখন নিশ্চেষ্টভাবে ঘুমাইতেছে। প্রভার বুকের ভিতরটা কি যেন এক অজানা অনুভূতিতে দুলিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে বালিশের উপর মাথাটা তুলিয়া হাত দিয়া সে তাহার ঘুমন্ত স্বামীর গলা জড়াইয়া

করিল। ডাকিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,...নড়াইতে গিয়া দেখিল, হাতে তাহার এতটুকু শক্তি নাই।...খোলা জানালা দিয়া শেষ-রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আবার ধীরে-ধীরে কোন্ সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে রতনমণির যখন ঘুম ভাঙিল, বাহিরে তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। অনতিদূরে জানালার সুমুখে রেল-লাইনের উপর সূর্য্যের আলো চিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রথমেই তাহার মনে হইল, এখনই তাহাকে এই লাইনের উপর দিয়াই কলিকাতার ট্রেন ধরিয়া ছুটিতে হইবে। তাহার এই অঙ্কশায়িনীর বিরুদ্ধে রাগ তাহার শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। আর-একবার সে শেষ-চেষ্টা করিয়া প্রভাকে জোরে-জোরে নাড়িয়া দিল, মুখে কোনও কথা বলিল না।

জোরে-জোরে নাড়িবার প্রয়োজন ছিল না। প্রভা চোখ খুলিল, কিন্তু খোলা জানালার পথে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লজ্জায় সে ধড়্-মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া একেবারে খাট হইতে লাফাইয়া পড়িল। এবং তাহার বিস্রস্ত বসনের প্রান্তভাগ রতনের হাত হইতে টানিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

রাগে দাঁত কট্‌-মট্ করিতে-করিতে জামার পকেট হইতে

জামাতা বাবাজীউ

একটা বিড়ি বাহির করিয়া রতনমণি ফস্ করিয়া দিয়াশালাইটা জ্বালিয়া ফেলিল।

রতনকে আজই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া, নিকুঞ্জ বিহারী যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন, সে কি বাবা? তাই কি হয় কখনও! আজকার দিনটা থেকে, কাল যেও।

একে সে রাগিয়াই ছিল, তাহার উপর চাকুরির অজুহাত দেখাইল। তাহার মুখ-চোখের দৃঢ় ভাবভঙ্গী দেখিয়া নিকুঞ্জবিহারী বেশী জেদ করিতে পারিলেন না। নিতান্ত কাতর অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কবে আসবে বাবা?

রতনমণি আশ্বাস দিল যে, সে ছুটি পাইলে আবার আসিবে।

এক ছড়া রূপার চেন ও একটি ঘড়ি জামাই-এর জন্য তিনি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। ষ্টেশনে আসিয়া ইণ্টার ক্লাসের একখানি হাওড়ার টিকিট, চেন, ঘড়ি এবং রাস্তা-খরচের জন্য দশটি টাকা তিনি রতনমণির হাতে দিয়া বলিলেন, ছুটি পেলেই আবার এসো বাবা, বুঝলে? বেয়াই-মশাইকে আমার নমস্কার দিও।

চেন ঘড়িটা রতন তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, এটা আপনি রাখুন, এইবার যখন আসব তখন নিয়ে যাবো!

হয়ত এটা তাহার মনে লাগিল না ভাবিয়া নিকুঞ্জবিহারী বলিলেন, কেন বাবা, একি তোমার পছন্দ হ'ল না? কেমন চাই বলো, তেমনি আনিয়ে দেবো।

—না, পছন্দ হয়েছে। ধরুন, আমি এবার এসে নিয়ে যাবো. পাল্টাতে হবে না।—বলিয়া সেটি তাহার হাতের উপর ফেলিয়া দিল।

ট্রেন্ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই কম্পিত হস্তে চেন ঘড়িটি ধরিয়া নিকুঞ্জবিহারী হাঁ করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শ্বশুরের বাসার পাশ দিয়া ট্রেন্‌খানা পার হইতেছিল। রতনমণি দেখিল, গতরাত্রে যে-ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল. সেই ঘরের খোলা জানালার পাশে সতৃষ্ণনয়নে প্রভা দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাকে সে দেখিতে পাইল, কিন্তু চলন্ত ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে প্রভা যে মুখখানি দেখিতে চাহিতেছিল, তাহা সে বেশ ঠাহর করিতে পারিল না।

কিন্তু প্রভাকে যখন আর কচি খুকী বলা চলে না, তখন তাহার এই নিতান্ত গর্হিত কম্মটা রতন তাহার স্বামী হইয়া কোনপ্রকারেই সমর্থন করিতে পারিল না। সে যে লোক দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং প্রতিদিন হয়ত সে এমনি করিয়াই ট্রেনের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়, ইহা সে অসংশয়ে ধারণা করিয়া লইল। এবং তাহার এই দুর্ব্বিনীত অবাধ্য স্ত্রীকে সে যে কেমন করিয়া চিরদিনের মত জব্দ করিয়া দিবে, আজ এই চলন্ত ট্রেনের গদি-আঁটা ইণ্টার-ক্লাসে বসিয়া রতনমণি সেই কথাটাই বারে-বারে চিন্তা করিতে লাগিল।

জামাতা বাবাজীউ

*　　*　　*　　*

পথে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। অণ্ডাল ষ্টেশনে একখানা মাল-গাড়ী লাইন হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, কাজেই রতনমণির ট্রেনখানি সমস্ত রাত্রি আসানসোল ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরের দিন বেলা প্রায় দুইটার সময় আসানসোল হইতে ট্রেন ছাড়িল। হাওড়ায় আসিয়া যখন পৌঁছিল, রাত্রি তখন প্রায় আটটা। বৃহস্পতিবারটাও পথেই কাটিয়া গেল। সেদিন আর রতনমণির অফিস করা হইল না।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ভবানীপুরের গলির ভিতর তাহাদের সেই ভাঙা মেসে রতনমণি যখন আসিয়া পৌঁছিল, ভবতোষ প্রভৃতি খেলোয়াড়গণের পাশাখেলার কলহ-কোলাহল তখন বেশ জোরে-জোরেই চলিতেছে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার থমথম করিতেছিল।

সিঁড়িতে দিয়াশলাই জ্বালিয়া ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রতনমণি উপরে উঠিয়া আসিল।

অফিস কামাই করিয়া রতনমণি যখন একদিন সেখানে দেরি করিয়া আসিয়াছে তখন তাহার পরামর্শমত রসদ যে সে নিশ্চয়ই কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, ভবতোষ পাশাগুলা হাঁক্ মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই নিঃসংশয়ে তাহা বুঝিয়া লইলেন।

—আচ্ছা, তোমরা একহাত বন্ধ রাখো, আমি এলাম বলে' !—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পাশার চেয়েও প্রিয়তম কোনও বস্তুর সন্ধানে রতনমণিকে একটুখানি তফাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন, দেরি হ'ল যে ? কত দিলে ?

রতনমণির রাগ তখনও কমে নাই। সুযোগ বুঝিয়া সে অম্লানবদনে বলিয়া বসিল, একটি পয়সাও না। এমন কি গাড়ী-ভাড়ার টাকাটা পর্যান্ত দিলে না, বিনা টিকিটে আস্‌তে হ'ল, তাই আসান্‌সোলে একদিন আট্‌কে' রেখেছিল।

রাগে প্রথমতঃ ভবতোষের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। কোটরপ্রবিষ্ট চোখ দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, বটে ?—জানি, সে চামারবেটাকে চিরকাল জানি আমি। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজী !...আচ্ছা—

বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিয়া লইয়া কহিলেন, এলি কেমন করে' ? তা হ'লে পথে ভারি কষ্ট হয়েছিল বল্‌ ?

রতনমণি ঘাড় নাড়িয়া তাহার কষ্টের কথা জানাইয়া দিল।

ভবতোষ গম্ভীরভাবে বলিলেন, যা সকাল-সকাল খেয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়্‌গে। তার পর আমি দেখে' নিচ্ছি, আমার ছেলের আর-একটা বিয়ে দিতে পারি, না, সে-বেটা বজ্জাৎ তার মেয়ের আর-একটা বিয়ে দিতে পারে ! হারামজাদা, পাজি কোথাকার !

বলিতে-বলিতে সেইখান হইতেই তিনি হাঁকিলেন, চন্দ্রকান্ত !

জামাতা বাবাজীউ

কি বল্‌ছ ব্রাদার্‌ ?—বলিয়া চন্দ্রকান্ত উঠিয়া আসিল।

—বল্‌ছি আমার মাথা-মুণ্ডু! যা ভেবেছিলাম তাই। হাঁ হে, সেই যে কালীঘাটে যে-মেয়েটি তুমি আমায় একদিন দেখাতে নিয়ে যাবে বল্‌ছিলে সেটি এখনও আছে, না বিয়ে হ'য়ে গেছে?

কেন দাদা? আবার কি 'ম্যারি' কর্‌বার ইচ্ছে হ'ল নাকি?

বস্তুতঃ ভবতোষ নিজের জন্যেই সে-মেয়ে একদিন দেখিতে যাইবেন বলিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তকে চোখ টিপিয়া দিয়া বলিলেন, না রতনের বিয়ে দেবো।

চন্দ্রকান্ত বলিল, কেন? সে-বউ?

আরে সেকথা আর বল্‌ছ কেন চন্দর্‌, শিবের অসাধ্যি ব্যামো—বন্ধ্যা। আমি চিরকাল এই ছোঁড়াটাকে বলে' এসেছি, বলি, যাস্‌নে হতভাগাটা, বাপের ব্যামো থাক্‌লে মেয়ের থাকবে তা'তে আর আশ্চর্য্যি কি? কিন্তু ও-বেটা শুন্‌লে না, মা-মরা বাছুরের মত কেঁদে' ছুটল।—তবে তাই দেখ ভাই চন্দর্‌, বুঝ্‌লে?

চন্দ্রকান্ত বলিল, সে আর বেশী কথা কি দাদা! সে ত হ'য়েই আছে। তবে তোমার 'ওপিনিয়ন্‌' কি রতন? মেয়ে বেশ ডাগর-মেয়ে।—বলিয়া সে রতনের মুখের পানে তাকাইল।

সেইরাত্রে হইলেও রতনমণির বিশেষ-কিছু আপত্তি ছিল না। দু'তিনবার ঘাড় নাড়িয়া প্রফুল্লমনে সে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাজিকর

বাজিকর

সে এক রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নবেলায় কলিকাতার একটা গলিরাস্তার মোড়ে বাজিকরের টুম্‌টুমি বাজিয়া উঠিল,—টুম্‌টুম্‌-টুম্‌-টুম্‌! টুম্‌-টুম্‌-টুম্‌-টুম্‌!...

মাসখানেক ধরিয়া এক ফোঁট বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র এত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে য় লোক-চলাচল এক্‌-প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। লাহলমুখর কলিকাতা নগরীটা, মনে হইতেছে যেন, গুমট্‌ গরমে একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পেটের দায়ে পথে-পথে ঘুরিয়া পরের করুণায় যাহারা আত্মসমর্পণ করে, রৌদ্র, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করিয়া উপার্জ্জনের জন্য এম্‌নি করিয়া পরিশ্রম তাহাদের করিতেই হয়।

সম্মুখে বড়-রাস্তার উপর ক্বচিৎ দু'একটা গাড়ী-ঘোড়া, মোটর ইত্যাদি যান-বাহন দেখা যাইতেছে। তাহাদের অলস-মন্থর গতি-ধ্বনি শুনিয়া মনে হয়, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা চলিয়াছে।

দুইটা বৃদ্ধ গরু বোঝাই-দেওয়া একটা গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের চাবুকের ঘায়ে তাহাদের পৃষ্ঠে ঘা হইয়া গিয়াছে,—মুখ দিয়া ফেনা ভাঙ্গিতেছে।...

৮

অতসী

একটা ছ্যাকৃড়া ঘোড়ার গাড়ী সশব্দে তাহাদের পার হইয়া গেল। ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দ ছাপাইয়া কোচম্যানের চাবুকের শব্দ বড় তীব্রভাবে কাণে আসিয়া বাজিতেছে। পঞ্জরাবশেষ ঘোড়া দুইটা লাফাইয়া লাফাইয়া কখনও জোড়ে কখনও ধীরে দৌড়িতেছিল!

পথপ্রান্তে হঠাৎ একজন রিক্‌শাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। দুইটা মোটা লোককে টানিয়া টানিয়া লোকটা একেবারে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। আরোহীদের মধ্যে একজন কহিল, আরে, ঢিমিক্ ঢিমিক্ কাহে করতা হ্যায়্—জোর্‌সে চলো। ঘণ্টার শব্দ আর শুনিতে পাওয়া গেল না। লোকটা প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

একজন ফিরিওয়ালা কি একটা সস্তা জিনিষের দর হাঁকিতেছিল,—বোধ করি এখনও তাহার আহারের সংস্থান হয় নাই।

পরক্ষণেই একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক কাতরকণ্ঠে একমুষ্টি অন্নের জন্য বৃথাই কাঁদিয়া গেল।···

বড় রাস্তার অনতিদূরে যে গলিটার ভিতর বাজিকর তাহার টুমটুমি বাজাইয়া ঘুরিতেছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বারবনিতাদের বাড়ী।

বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গেছে। মুখের উপর খোচা খোচা দাড়ি-গোঁফ, পরিধানে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্র, কাঁধে একটা

ঝুলি, বামহস্তে একটি ছোট মাটির ভাঁড় এবং সবুজ রঙের একটি কাঠের টিয়াপাখী, ডানহাতে ডমরুর মত একটি টুম্‌টুমি!

রৌদ্রের তেজে রাস্তার তপ্ত ধুলার উপর সে হাঁটিতে পারিতেছিল না। দেয়ালের কোণ ঘেঁসিয়া যে-ছায়াটুকু পড়িয়াছে, তাহারই উপর দিয়া সে অতি কষ্টে চলিতেছিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া আবার টুম্‌টুমি বাজাইয়া সে তাহার পিপাসা দীর্ণ শুষ্ককণ্ঠে হাঁকিল, বাজি আছে, খেলা আছে,—ভূত আছে, ওষুধ আ—ছে!...

আজ যে রাস্তা ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল, সেখানে পূর্ব্বে কোন দিন সে আসিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। এই সব অপরিচিত স্থানেই তাহার উপার্জ্জনের সম্ভাবনা কিছু বেশী। তাই সে তাহার বার্দ্ধক্য-জীর্ণ শিথিল হস্তের মুষ্টি প্রাণপণ শক্তিতে দৃঢ় করিয়া তাহার টুম্‌টুমি বাজাইয়া চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের সুমুখে মধ্যাহ্নবেলা ক্রমশঃ অপরাহ্নের দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল,—রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি ক্রমশঃ তেজহীন ম্লান হইয়া আসিল, তথাপি একটা লোকও তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বুড়া ভাবিল, আজ বুঝি বা তাহাকে উপবাস করিয়াই কাটাইতে হয়।

সেই রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি লোক, কালোরঙের শতচ্ছিন্ন একটি জামা গায়ে দিয়া পৃষ্ঠে তাহার একটি ছোট বোচ্‌কা বাঁধিয়া

চলিতেছিল। সহসা সে অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, রিপু কম্ম আছে,—রিপু কম্ম!…লোকটি একবার বড় সকরুণভাবে বৃদ্ধ বাজিকরের দিকে তাকাইয়া তাহার জরাজীর্ণ চটি জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৃদ্ধ যতই কাতর হইয়া পড়িতেছিল, দুঃখ-দুর্ভাবনায় মন তাহার ততই পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার বাজনা শুনিয়া পাশের ঘরের একটি মেয়ে দরজার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহার একটুখানি আশা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাগে এবং দুঃখে তাহার দেহমন ভরিয়া উঠিল,—হাতের বাজনাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

তিন-চারিটা ঘর পার হইয়া আসিতেই, পাশের একটা বাড়ীর জানালা খুলিয়া এক তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও কি গা?

বৃদ্ধ কহিল, বাজি আছে মা, কত রকমের খেলা আছে, কাঠের টিয়া জল খাবে,—টাকা পয়সা উড়ে যাবে,—আরও কত আছে মা!…দেখ্‌বি? বলিয়া আগ্রহাতিশয্যে বৃদ্ধ তাহার কোটরপ্রবিষ্ট দুইটা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়া তরুণীর মুখের পানে এইবার তাকাইল।

মেয়েটি বলিল, বাইরের দরজা দিয়ে উঠোনে পেরিয়ে এস,—দেখ্‌ব।

এই বলিয়া সে পার্জ্জন করিতে হয়, সে প্রাণান্তকর চিন্তা
উপরের রেলিং ধরিয়ৃত হইল!...সে আজ অনেক দিনের কথা।
কাকে ডাক্‌চিস্ লা কি বোন্, গুড, সংসারের মধ্যে সে ছিল তখন
কিরণ বলিল, নেংসেরের বালিকা! এক দিন এম্‌নি একজন
আ মরি! বাজি খেলাইয়া বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের
কিন্তু সে চলিয়া হইল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের ছেলে.
আরও অনেক মেয়ে হাহ! সেই উৎসুক বালক-বালিকার মধ্যে
বুড়াকে তাহার াদের আনন্দে যোগ দিয়া হৈ হৈ করিয়া
এবার। কত নেবে? আর বাজি দেখিয়া বৈকালে যখন সে বাড়ী
একে-একে তাহাকে কত না তিরস্কার করিলেন! তাহার
বলিল, আগে এক তাহার সঙ্গে ছিল,--তাহার জন্য সেও মা'র
তার পর দাম দিস্,--র ভাই,—যাহাকে সে এত ভালবাসিত,–
বুড়ার মুখে দর-কম আছে!...কত বড় হইয়াছে সে!...তাহার
করিয়া হাসিয়া উঠিল।দের সেই ঘর, সেই গ্রাম!...সে তো ইচ্ছা
কিরণ তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে যাইতে পারে না! যে
পাত্রে ঢালিয়া দিতেইতলায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, যাহার
বলিল, এইবার স্বাধ্ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে,—যে
টাকার? ানন্দ নিরানন্দ, প্রতি দিনের প্রত্যেকটি অতি
এই বলিয়া বাজির আনন্দ এবং পবিত্র মাধুর্য্য আজ তাহার
একটা লম্বা হাড় বাঁকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে পথ কি

আজ তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল?...মাগো! সে যে তাহার একটি মুহূর্ত্তের ভুলের জন্য আজ মহাসমুদ্রের অতলতলে তলাইয়া গেছে।...এই উঞ্ছবৃত্তি হইতে তাহার কি আর নিস্তার নাই মা!...

কিরণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল!...

বুড়া একটা নূতন খেলা দেখাইবার জন্য তাহার ঝুলি হইতে কি· একটা বস্তু বাহির করিতে যাইবে, এমন সময় কিরণ কহিল, হাঁগা, তোমার দেশ কোথায়?

বাজিকর কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আমার দেশ —মেদিনীপুর জেলায় মা।

কিরণের বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলায়। সে একবার ভাবিল, বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর কত দূরে এবং সে কোনও দিন বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের জিলায় গিয়াছে কি না, সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কোন কথাই তাহার জিজ্ঞাসা করা হইল না। আরও যে দুইটা মেয়ে দাঁড়াইয়া বাজি দেখিতেছিল, কিরণ একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় জুতা মচ্ মচ্ করিয়া আফিস ফেরত কিরণের এক বাবু হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্থি এবং চর্ম্ম ব্যতীত শরীরে তাহার মাংস আছে বলিয়া বোধ হয় না; চোখ দুইটা বড় বড়,—সে যে কত বড় দুর্নিবার শক্তিতে নিজেকে

ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাহার বিবর্ণ মলিন ঠোঁট দুইটা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একবার বুড়া বাজিকরের দিকে, একবার কিরণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাবু বলিল, কি হচ্ছে এ সব?

কিরণ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বুড়া কহিল, দুটা বাজি দেখাচ্ছি বাবু। এই দেখুন, এই তো একটা হাড়,—বলিয়া বাবুকে কি একটা তারিফ্‌ সে দেখাইতে যাইতেছিল; বাবু বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হয়েছে। ওসব ঢের দেখেছি বাবা, তুমি চুপ কর।

কিরণ তাহার বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ওগো, একটা টাকা দাও দেখি?

বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা? কি হবে টাকা?

ওকে দেব। বলিয়া সে বাজিকরকে দেখাইয়া দিল।

তা আবার টাকা কেন? দু'গণ্ডা পয়সা দিয়ে দাও না?

তুমি দাও না একটি টাকা? আমি আবার দেব' তোমায়।

বাবু বাধ্য হইয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বাজিকরের থলির নিকট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, যাও বাপু যাও। মেয়েদের ভুলিয়ে খুব রোজগার করতে শিখেছ যা হোক!...এসো কিরণ এসো। বলিয়া বাবু তাহার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিল, আরও গোটা দুই ভাল বাজি দেখ্‌বি মা?

কিরণ সজোরে একটা হেঁচ্‌কা টান্‌ দিয়া বাবুর হাত হইতে তাহার কাপড়খানা টানিয়া লইল। বলিল, তুমি একটু বসো না বাপু, আমি যাচ্ছি।—নাও, দেখাও তো তুমি। বলিয়া কিরণ তাহার চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

বাবু একা ঘরের ভিতর অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রোষগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, কিরণ!

এ সময় কিরণের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, সেও রাগিয়া উত্তর দিল, যাব না, যাও।

বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কিরণের পশ্চাতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দাও কিরণ, আমি চল্লুম।

ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া বুড়া তাহার আসবাব পত্র গুটাইয়া লইতেছিল। বলিল, হয়ে গেছে বাবু, আমি উঠি।

না, তুমি যেও না। বলিয়া কিরণ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার বালিশের তলা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিল, ভারি ত টাকা দেখাচ্ছেন,—এই নাও তোমার টাকা।

রাগে হন্‌ হন্‌ করিয়া বাবু বাহির হইয়া গেল।

বুড়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, আমি তাহ'লে আসি মা।

দাও। বলিয়া কিরণ মুখ ভার করিয়া কবাট ধরিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বুড়া বাজিকর চলিয়া গেল।

কিরণ একবার বাহিরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া রাস্তার উপর উঁকি মারিয়া দেখিল, তাহার বাবু সজোরে হাঁটিয়া গলিটার প্রায় শেষপ্রান্তে তাহারই কোন্ এক প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

কিরণ ধীরে ধীরে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ছোট জানালাটির সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা কিছুই হয় নাই,—সে কথা তাহার মনেও ছিল না! কিসের যেন একটা অশান্ত আক্ষেপ তাহার মনের ভিতর অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া মরিতে লাগিল। কিরণ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার জন্য জানালার বাহিরে তাকাইল। তাহার এই জানালার পথে দূরে বড় রাস্তাটা পর্য্যন্ত নজর চলিতেছিল। রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া, পথিকের চলাচল, সবদিন যেমন চলে, আজিও তেমনি চলিতেছে। বেল-ফুলের মালা, ঘুগ্‌নিদানা, কুল্‌ফি বরফ, রোজ যেমন হাঁকিয়া যায়, আজিও তাহারা তেমনি হাঁকিয়া গেল।...

দরজায় দাঁড়াইয়া ক্রেতা ডাকিবার জন্য একটি মেয়ে ডাকিল, আসবি না কিরণ?

তাহাদের প্রতিদিনের বীভৎস কর্ম্ম-পদ্ধতি আজ কিরণের নিকট

বিষের মতন মনে হইতেছিল,—সে ঘাড় নাড়িয়া কোন রকমে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, সে যাইবে না।

এতগুলা চোখের সুমুখে বাজিকর যেমন করিয়া জিনিষগুলা উড়াইয়া দিতেছিল,—আজ মনে হইল,তেমনি করিয়া কে যেন তাহার মনটাকেও কোথায় কোন্ দিক দিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে!

ধীরে ধীরে দরজায় খিল্ আঁটিয়া দিয়া সে তাহার বিছানার একপার্শ্বে এলাইয়া পড়িল।

এমন সময় কালো কুচ্‌কুচে বিরাট এক মাংস-স্তূপের মত একটা লোক হেলিয়া-দুলিয়া কিরণের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের মধ্যে তাহার গোলাকার চোখ দুইটা রাঙা আলোর মতই জ্বলিতেছিল!

কিরণের রুদ্ধ দরজায় গুম্‌গুম্ করিয়া বারকতক করাঘাত করিয়া পাশের একটি মেয়েকে সে জিজ্ঞাসা করিল, লোক আছে না কি?

মেয়েটা উত্তর দিল, আজ ওর ভাব লেগেছে বাবু, কাল এসো।

আর একটি মেয়ে যেন তাহার মুখের কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, কাল কেন, আর খানিক পরেই এসো।

দু'জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথের ধারে কতকগুলা খেঁকি কুকুর সেই সময় ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিতেছিল!......

আলো-আঁধারী

আলো-আঁধারী

গ্রামের একটি ছোট মাইনর-স্কুলের সুমুখে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়িয়া ছিল। তাহারই উপর যাত্রা গান চলিতেছে। শীতকালের রাত্রি; হইলে কি হয়, পাড়াগায়ে বহুকাল পরে এই যাত্রার দল আসিয়াছে,—কাজেই লোক জড় হইয়াছে বিস্তর। স্কুলের চেয়ার-বেঞ্চি আসরের বাহিরে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে, বাবুদের দুইজন ছোক্‌রা বসিয়া আছে দু'খানা চেয়ারের উপর। মেয়েরা বসিয়াছিল স্কুলের খড়ো-চালায়। জায়গা কম, অথচ লোক বেশী, অত্যন্ত গোলমাল হইতেছিল। মাঝে মাঝে দু'একজন চীৎকার করিতেছে, চুপ! চুপ। চশ্‌মা-পরা বাবুদের ছেলেটি পাশের একজন ছোক্‌রাকে বলিয়া দিল, খুব জোরে জোরে বল হে একবার 'কিপ সাইলেন্ট'। ছোক্‌রা ইংরাজী জানিত না, বলিয়া ফেলিল, 'চুপ, সাইলেন্ট'! বাবুদের ছেলে দু'টি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গোলমাল কাহাকেও চুপ করাইতে হইল না; কৃষ্ণরাধিকা চমৎকার গান গাহিতেছিল,—তাহাদের গান শুনিয়া সকলে চুপ করিল।

চশ্‌মা পরা ছেলেটি বলিল,—কেষ্ট বেশ গাচ্ছে, না, কি বল মেজ্‌দা?

মেজ-দা বলিল,—কিন্তু ভারি বিশ্রী দেখ্‌তে।

হুঁ।

আর ওই চেয়ে দ্যাখ্‌ রাধিকার চেহারাখানা! ঈস্‌! যেন জ্বল্‌ছে। বাঃ, বাঃ, বলিহারি!

হুঁ। ভারি চমৎকার।

আচ্ছা, ও যদি মেয়ে হ'তো ভাই?

ছেলেটি একবার হাসিল।

মেজদা বলিল,—আচ্ছা, দেখ্‌বি শচি ওকে আমি এইখানে ডাক্‌ব? হাতের ইসারা ক'রে?

শচী তাহার চশ্‌মাটি চোখ হইতে একবার খুলিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে বলিল,—ডাক্‌তে হবে না, নিজেই আস্‌বে। চল্‌ একবার বাইরে যাই। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ রাধিকার গান তখন বন্ধ হইয়াছে।

মেজ্‌দার বিশ্বাস হইল না। আগের কথার জের টানিয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই যেন আসে, না ডাক্‌লে?

শচী তাহার চশ্‌মাটি পুনরায় পরিল। চলিতে চলিতে বলিল,—আস্‌বে, আমায় বলে' গেছে।

কি বলে' গেছে?

শচী বলিল, সন্ধ্যায় এসেছিল আমার কাছে। এসেই আমার হাত দু'টো চেপে ধরে' বল্‌লে, বাড়ী থেকে আমায় একটু-খানি দুধ আনিয়ে দেবেন বাবু? বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

মেজ্‌দা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, দিলিনে কেন? আমি ত দুধ খাইনে রাত্রে।

বা, দিলাম যে এনে। সেটা ও তক্ষুণি ঢক্‌-ঢক্‌ করে' খেয়ে ফেল্লে। খেয়ে কি বল্‌লে জানো?

কি?

উভয়েই তখন স্কুলের 'গেটে'র সাম্‌নে বাঁধানো পিল্‌পেটার নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া শচী বলিল, আমার পা দুটো ছুঁয়ে হাতজোড় করে' বল্‌লে, দোহাই বড়বাবু, আর-কেউ যেন না শোনে একথা।—আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, যদি শোনে ত কি হবে? সে বল্‌লে, ওরে বাবা! ম্যানেজার শুন্‌লে আমার ছ'টি পয়সা মারা যাবে বাবু,—রাতের খোরাকী।

মেজ্‌দাও সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আহা, ভারি কষ্ট ওদের। বলিয়াই সে একটুখানি থামিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, —তাহ'লে কেমন করে' ও আস্‌বে আবার এখানে?

যাবার বেলা বলে' গেল, একটা গান গেয়েই আমি যাব বাবু আপনার কাছে; ওই চায়ের দোকান থেকে আমায় এক

পেয়ালা চা দিতে বলে' দেবেন বাবু, তাহ'লে আজ আমার ছ'টা পয়সা বেঁচে যাবে। আমি এখানে আস্‌তে বলে' দিয়েছি।

শীতের রাত্রে চা বেশী বিক্রি হইবে ভাবিয়া একটা লোক অদূরে পথের উপরেই চায়ের দোকান খুলিয়াছিল। মেজ্‌দা একবার পিছন্‌ ফিরিয়া সেইদিক্‌ পানে তাকাইয়া দেখিল। জ্যোৎস্না রাত্রি। চাঁদোয়ার বাইরে মাঠের উপর কুয়াশার মত হিম পড়িতেছে। চায়ের জল-চড়ানো উনানের পাশে চা-ওয়ালা জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। দুইজন লোক সেইখানে দাঁড়াইয়া চা খাইতেছিল। গাঁয়ের একজন আফিংখোর বুড়া-ভদ্রলোক চায়ের বাটিটি সবেমাত্র শেষ করিয়া সেইখানে নামাইয়া দিয়া বলিল, তা' তুমি বেশ করেছ গোপাল, শীতকালে এই চায়ের দোকানটি করে' তুমি অতি উত্তম কাজ করেছ বাবা। তারপর বুড়া তাহার ট্যাঁক্‌ হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া বলিল, এই একটি পয়সার বেশী আমি আর দিতে পার্‌ব না বাপ্‌, তা' তুমি চার পয়সাই বল, আর দু'-আনাই বল এর দাম।—এই লইয়া তাহাদের বচসা চলিতে লাগিল।

মেজ্‌দা হঠাৎ মুখ তুলিতেই দেখিল, আসরে তখন পুরাদমে চীৎকার চলিয়াছে-বটে, কিন্তু রাধিকা তেমনি সাজপোষাক পরিয়াই শচীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মেজ্‌দা তাহার সুন্দর মুখখানির পানে একবার তাকাইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি ছোক্‌রা? বাড়ী কোথায়?

রাধিকা-ছোক্‌রাটি তেমনি মেয়েলি-গলায় উত্তর দিল, আজ্ঞে আমার নাম শ্রীমন্মথ নাথ কুণ্ডু। দলের সবাই আমায় টুস্‌কি বলে' ডাকে। এই বলিয়া শচীর কাছে সে তাহার মুখখানি লইয়া গিয়া চুপি-চুপি কহিল, ইনি কে বাবু আপনার?

কথাটা মেজ্‌দা শুনিতে পাইল। শচী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল, আমি ওর মেজ্‌দা, ও আমার ছোট ভাই—

রাধিকা ওরফে টুস্‌কি বলিল, আমি অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছি বাবু, এই দলের সঙ্গে, কিন্তু ভাইয়ে-ভাইয়ে এমন মিল আমি কখনও দেখিনি।—আপনাদের ওই কুঁয়োর জলটি ভারি চমৎকার বাবু,—মস্ত জমিদার আপনারা, আপনাদের বাড়ীখানিও বেশ!

মেজ্‌দা চুপ করিয়া রহিল।

টুস্‌কি এইবার সেই চায়ের দোকানটার দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া কহিল, ওই যে চা তৈরী হচ্ছে বাবু, ওকি আপনাদের ওই কুঁয়োর জল নিয়ে? তাহ'লে চা বেশ ভালই হবে।

মেজ্‌দা জিজ্ঞাসা করিল, চা খাবে তুমি? যাও না, খেয়ে এস, আমি এইখান থেকে বলে' দিচ্ছি গোপালকে।—ওহে গোপাল, অ গোপাল, একে এক পেয়ালা চা দাও ত!

টুস্‌কি দোকানে গিয়া চা খাইল। ফিরিবার সময় গোপালের কাছে পয়সা-দুইয়ের পান ও এক প্যাকেট্ সিগারেট লইয়া পুনরায় সে বাবুদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মেজ্‌দা জিজ্ঞাসা করিল, চা খেলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই নিন্ বাবু, পান নিন্—পানও নিয়ে এলাম ছ' পয়সার। বলিয়া সে তাহার হাতের ঠোঙাটি মেজ্‌দা ও শচীর মাঝখানে ধরিয়া দিল।

শচী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পান আমি খাইনে।

পান খাওয়া অভ্যাস মেজ্‌দারও বড় একটা ছিল না, কিন্তু সে দিন সে এই রাধিকার হাত হইতে এক খিলি পান লইয়া মুখে পুরিল।

তাহ'লে এতগুলো পান কি-জন্যে আন্‌লাম বাবু? আচ্ছা থাক্। বলিয়া রাধিকা তাহার জ্যাকেটের বুকের তলায় পানের ঠোঙাটি লুকাইয়া রাখিয়া কহিল, আমি তাহ'লে আসি বাবু, তা' নইলে এক্ষুনি আবার ডাক্ পড়বে।

একটুখানি হাসিয়া মেয়েলি-ঢংএ পা ফেলিয়া শাড়ী দুলাইয়া মাথা হেলাইয়া টুসকি চলিয়া গেল। মেজ্‌দা একদৃষ্টে তাহার চলিয়া যাওয়ার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আসরে তখন তাহাদের কোনও কাজ ছিল না। পান খাইয়া ঠোঁট দুইটা রাঙা করিয়া সাজ-ঘরের অনতিদূরে একটা নিমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া রাধিকা সিগারেট টানিতেছিল। সাজ-ঘর হইতে কৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে পাইল; তাড়াতাড়ি কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, দিস্ মাইরি আমাকেও এক টান্।—উঃ ভারি শীত! বলিয়া সে ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

যাঃ! দেব না। পারিস্ত চেয়ে আন্‌গে না তুই। বলিয়া টুস্‌কি তাহার জ্বলন্ত সিগারেটটা গাছের গুঁড়িতে টিপিয়া নিভাইয়া ফেলিল।

কৃষ্ণ তাহার কালি-মুখখানি আরও কালি করিয়া বলিল, কোথা?

উই স্থাথ্‌ বাবুদের কাছে। আমি চা খেয়ে এলাম, পান নিয়ে এলাম। বলিয়া সে কেষ্টকে কাছে ডাকিয়া বাবুদের দেখাইয়া দিল

এই চাওয়া-চাওয়ির প্রতিযোগিতায় টুস্‌কিই চিরকাল জয়লাভ করে, কৃষ্ণ তাহা জানিত। বলিল, না, দেবে না।

টুস্‌কি বলিল, ভারি ভাল লোক, তুই যা। কিচ্ছু করতে হবে না। চায়ের দোকানে এক পেয়ালা চা আগে খেয়ে নিয়ে বাবুদের বল্‌গে,—বাবু, চা খেলাম, পয়সা দিন্‌। তাহ'লেই দেবে।

কৃষ্ণ সেই আশ্বাসে বাবুদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবুরা তখন পুনরায় আসরে আসিয়া বসিয়াছে। শচী তাহাকে দেখিতে পায় নাই। মেজ্‌দা দেখিয়াও দেখিল না। কৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইখানে ঘোরাফেরা করিল, আলোর সুমুখে আসিয়া বার-দুই দাঁড়াইল, কিন্তু কেহই তাহাকে লক্ষ্য করিল না। একে পৌষের দুরন্ত শীত, তাহার উপর কৃষ্ণ সাজিয়াছে, একমাত্র পীতধড়া ছাড়া আর কিছু পরিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহাতে শীত ভাঙে না, বেচারা একটুখানি চা খাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। অবশেষে

টুন্‌কির পরামর্শটাই সে ঠিক মনে করিল। চায়ের দোকানে গিয়া বলিল, দাও ত ভাই চা এক কাপ।

গোপাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জাত? ভাঁড়ে, না কাপে?

শীতে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। ডান হাতটা বাঁ-কাঁধে এবং বাঁ-হাতটা ডান-কাঁধের উপর বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বামুন।

টিনের একটা প্রকাণ্ড কেট্‌লির মধ্যে তৈরী-চা উনানের উপর গরম হইতেছিল; তৎক্ষণাৎ পেয়ালার উপর চা ঢালিয়া পেয়ালাটি গোপাল তাহার হাতে তুলিয়া দিল। ডাঁটি-ভাঙা গরম পেয়ালাটি যত আনন্দে সে হাতে তুলিয়া লইল, তত আনন্দে সে পান করিতে পারিল না। ফুঁ দিয়া একটু-একটু করিয়া খাইতে খাইতে বড় উদ্‌গ্রীব হইয়া বাবুদের সেই ছেলেদুটির পানে সে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল।

চাটুকু শেষ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, অতিশয় দক্ষতার সহিত কম্পিত হস্তে বাটিটি মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণ বলিল, বাবু পয়সা দেবে, আন্‌ছি।—বলিয়াই সে বাবুদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; গোপাল ছাড়িবার ছেলে নয়,—কেষ্ট-ঠাকুরের পিছনের দিকের সেই চুম্‌কি-দেওয়া ঝিক্‌মিকে ঝালরটার উপর চট্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, উ-সব হবেক্ নাই কত্তা, ফেল্ কড়ি, মাখ্ তেল!

দড়ি-বাঁধা পোষাকের সঙ্গে গলায় টান্ পড়িতেই কৃষ্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মিনতি-কাতর চোখে সে গোপালের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, এই যে, এই যে, বাবু—বাবু দেবেন। আঃ, ছাড়ো না ভাই! এই যে ডাক্‌ছি—বাবু! বাবু!

আপাদমস্তক কালো পোষাক পরিয়া কয়েক্‌টা ভূত তখন আসরের মাঝে লাফালাফি দাপাদাপি করিয়া কি-একটা হাসির গান গাহিতেছিল,—সেই গোলমালে কিছুই আর শোনা গেল না।

ভয়ে ভাবনায় কৃষ্ণের তখন হইয়া গিয়াছে। এই শ্মশান দৃশ্যের পরেই কেষ্টর গান,—কোনরকমে এই হাঙ্গামা যদি একবার ম্যানেজারের নজরে পড়ে তাহা হইলেই ত'...

কৃষ্ণ বলিল, ছেড়ে দাও না? আমি চেয়ে আন্‌ছি বাবুদের কাছে।

বলিতে বলিতেই শ্মশান-দৃশ্যের শেষ হইয়া গেল। ভূতগুলা ছুটিয়া পলায়ন করিবামাত্র চপ্ করিয়া একটা ড্রপের 'বেল্' পড়িল। কেষ্ট আসিতেছে না দেখিয়া চারিদিকে চাওয়া-চাওয়ি চলিতে লাগিল। সাজ-ঘর হইতে রাধিকা ডাকিল, কেষ্ট!

কে একটা লোক বলিয়া উঠিল, ও বাপ কেষ্ট রে—

কেষ্টর চিক্‌মিকে পীতধড়া নজরে পড়িতে দেরি হইল না। একটা ছড়ি হাতে লইয়া ম্যানেজার-বাবু চায়ের দোকানে ছুটিয়া আসিলেন। কেষ্টর কীর্ত্তি দেখিয়া পট্ করিয়া প্রথমে তাহার মাথার

উপর একটা ছড়ি বসাইয়া দিয়া বলিলেন, শূয়ার ! এঁঃ ! কাজের সময় চা খেতে এসেছেন !

গোপাল বলিয়া উঠিল, তার উপর বিনি পয়সায় মহাশয় !

বটে ? আচ্ছা, তবে চা খেয়েই থাক্ আজ। বলিয়া তিনি তাহার পকেট হইতে একটি আনি বাহির করিয়া গোপালের দাম চুকাইয়া দিলেন।

আসরে আবার কৃষ্ণ-রাধিকার গান চলিতে লাগিল। চোখের জলে কালো কাজল ভিজিয়া তাহার গায়ের রঙে মিশিয়া গেল বলিয়া ধরা পড়িল না, নচেৎ সাদা রং হইলে আজ কেষ্টর কান্না কাজলের ছাপে হাতে হাতে ধরা পড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

পূর্ব্বের সেই লোকটাই বোধকরি কান্নার সুরে বলিয়া উঠিল, আহা, কেষ্ট, বাপ আমার !

ম্যানেজারের হাতে কেষ্টর লাঞ্ছনা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, প্রায় সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শচীতে ও আমাদের মেজ্‌দায় তখন হাসাহাসি চলিতেছিল।

তাহার পর কৃষ্ণ-রাধিকা সেই-যে আসর হইতে বাহির হইয়া গেল, দু'তিনটা অঙ্কের শেষেও তাহাদের আর দেখা পাওয়া গেল না।

রাত্রি তখন প্রায় চারটা। ভোরের হিমে হাত-পা যেন বরফের মত জমাইয়া তুলিতেছিল। অনেক লোক যেখানে-সেখানে মুখ

গুঁজিয়া জড়-সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গান-বাজনার জোরও তখন ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল।

শচী বলিল, ঘুম পাচ্ছে মেজ্‌দা, চল যাই।

মেজ্‌দা কহিল, হ্যাঁ যাই। কই প্রোগ্রামখানা দেখ্‌ দেখি কেষ্ট রাধিকা কোন্‌ খানে আছে—

সমস্ত কাগজখানা খুঁজিয়া শচী বলিল, একেবারে সেই যবনিকার আগে। এখনও অনেক দেরি। চল।

চল্‌ তবে। বলিয়া মেজ্‌দা উঠিল। কিন্তু তাহার অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি রাধিকাকে খুঁজিতে গিয়া কেষ্টর উপরেই গিয়া পড়িল। সাজঘরের দরজায় একটা উনানে তাহাদের ভাত রাঁধা হইয়াছিল,নিভন্তপ্রায় সেই উনানের ধারে বসিয়া ঘুমের ঘোরে ঢুলিতে ঢুলিতে কেষ্ট তখন তাহার হাত-পা গরম করিয়া লইতেছিল......

পরদিন তাহাদের বিদায়ের দিন। ঘুম ভাঙিতেই অনেকের ন'টা বাজিল। মেজ্‌দার উপর বিদায়ের ভার।

ম্যানেজারের হাতে টাকাগুলি ধরিয়া দিয়া মেজ্‌দা চলিয়া আসিতেছিল, ম্যানেজার-বাবু অনুনয়ের সুরে বলিলেন, আমাদের কেষ্ট বেশ গান গায়। আমরা যেখানেই যাই বাবু, পাঁচটি করে' টাকা সে বক্‌শিশ পেয়ে থাকে,—আপনিও দিন বাবু!

মেজ্‌দা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেষ্ট? দূর! দূর! তার চেয়ে আপনাদের রাধিকা ভাল। কোথায় সে ছোক্‌রা?

বেশ, তাকেই দিন। বলিয়া ম্যানেজারবাবু হাঁকিলেন, টুস্‌কি! টুস্‌কি!

স্কুলের একটা ঘর হইতে টুস্‌কি বাহির হইয়া আসিল। মুখ-হাতের 'পেন্টে'র দাগ তখন কতক্ মুছিয়াছে, কতক্ মুছে নাই। প্রথম দেখিয়া মেজ্‌দা তাহাকে চিনিতে পারিল না। অনাহারে অনিদ্রায় জরাজীর্ণ কঙ্কালসার একটি ছেলেকে যেন ভাল মুখের একখানি মুখোস পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুখোস্‌খানিও আর বেশী দিন টিকিবে বলিয়া মনে হয় না,—চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, গাল দুইটা তোপ্‌ড়া হইয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে স্বাস্থ্যের এতটুকু চিহ্ন কোথাও নাই……

মেজ্‌দা চলিয়া আসিতেছিল। ম্যানেজার বাবু বলিলেন, হয়ে যাক্ বাবু,—তাহ'লে কিছু হয়ে যাক্।

দুটি টাকা তাঁহার হাতে দিয়া মেজ্‌দা বলিল, এই দু'জনের দু' টাকা।

টাকা দুইটি পকেটে ফেলিয়া খুশী হইয়া তিনি সাজ-ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন। আসরের এক পাশে সতরঞ্চ-জড়ানো একটা ঘুমন্ত লোকের গায়ে হোঁচট্ খাইয়া তিনি পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কে হে?

ম্যানেজারের ডাক শুনিয়া ছেঁড়া সতরঞ্চের ভিতর হইতে কেষ্টর মাথাটা হঠাৎ উঁচু হইয়া উঠিল। এমন অসময়ে এখানে তাহাকে

ঘুমাইতে দেখিয়া ম্যানেজারের মাথার আগুন কে যেন দপ্ করিয়া জ্বালিয়া দিল; কানে ধরিয়া চড়্ চড়্ করিয়া তিনি তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া তুলিলেন।

যেতে হবে না হারামজাদা? না, এইখানেই থাক্‌বি আজ? বলিতে বলিতে ঠাস্ ঠাস করিয়া তাহার মাথায় তিনি আরও গোটা-কতক্ চড় বসাইয়া দিলেন।

এত মার খাইয়াও কেষ্ট কাঁদিল না, বাবুদের দয়াধর্ম্মের কথা গত কল্য সে টুসকির মুখে শুনিয়াছিল, তাই বারে বারে সতৃষ্ণ নয়নে সে মেজদার মুখের পানে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল।

আদরিণী

ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

সত্য বলিতে গেলে নিতান্ত কদাকার। বুড়া না হইলেও যুবা তাহাকে বলিতে পারা যায় না। জিরাফের মত গলাটা লম্বা, পিঠ কুঁজো, এত রোগা যে আমাদের বাংলাদেশেও সচরাচর সেরূপ রোগা-লোক নজরে পড়ে না। চোখ দুইটা বড় এবং মাদক খাইয়া খাইয়া সর্বদা লাল হইয়াই থাকে, তবে, মাথার চুল আর টেরির বাহার আছে। মোট কথা, নারাণীর পাশে তাহাকে দাঁড় করাইয়া স্বচক্ষে এই যুগল-মূর্ত্তি দেখিয়াও কেহ যদি নারাণীকে সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা হও, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, তাহা হইলে এই বেচারা মেয়েটাকে গাল দেওয়া হয়। তারিণী মুখুয্যে সে-কথা স্বীকার করেন না, বলেন, যতই হোক্, রাজকুলিনের বাচ্চা বাবা, ইস্পাতের টুক্‌রো।

এইবার—গৌরী। মজা এইখানেই। গৌরীর মা বোধকরি সুন্দরী ছিলেন না, তাই গৌরীর চেহারা দেখিলে হারাণী-নারাণীর বোন্ বলিয়া তাহাকে চেনা যায় না। মেয়েটার বয়স সাত বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু গত বৎসর তাহার বিবাহ হইয়া গেছে। ব্যাপারটা তবে একটুখানি খুলিয়াই বলি।

তারিণী মুখুয্যের ষষ্ঠ পক্ষ যখন বাঁচিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার মামাত না পিস্‌তুতো একটি ভাই মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে আসিত। ছেলেটির নাম মাণিক, বয়স দশ-এগারো বছর, বেশ ফুট্‌-ফুটে চেহারা। কিন্তু শুধু ফুট্‌-ফুটে বলিলে ঠিক বলা হয় না। নিটোল-সুন্দর মুখখানির উপর কালো কোঁকড়া চুলের বাহার

কপালের দু'পাশে নামিয়া আসিয়াছে, বেশ ঢলঢলে দুটি কালো চোখ, বুকখানা বেশ চওড়া, হাত-পায়ের গড়ন অতি চমৎকার। সে এক অদ্ভুত ছেলে! বাপ, মা, কেউ কোথাও নাই,—তাই একাকী ওই দশ-এগারো বছরের ছেলেটা আত্মীয়ের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত। এক জায়গায় বসিয়া থাকা যেন তার স্বভাব বিরুদ্ধ, মাঝে-মাঝে হঠাৎ কোন্‌দিক দিয়া যে, সে উধাও হইয়া যায়, কেহ বুঝিতে পারে না, আবার কোন্‌দিন হয়ত' তেম্‌নি হট্ করিয়াই আসিয়া হাজির! কৈফিয়ৎ চাহিলে কোনও উত্তর দেয় না,—চুপ করিয়া থাকে। কথা সে খুব কম বলে; কিন্তু যখন বলে,—গলার সুর তার এত মিষ্টি, মনে হয় যেন এই কথার বাণে আর রূপের ফাঁদে সমস্ত বিশ্বভুবন সে জয় করিয়া ফেলিবে।

একদিন আপনমনেই গুন্ গুন্ করিয়া কি একটা গান সে গাহিতেছিল, নারাণী ঘরের ভিতর হইতে খানিক্‌টা শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে চুপ হইয়া গেল।

নারাণী ডাকিল, মাণিক!

মাণিক জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইল।

নারাণী হাতের ইসারায় তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, এসো।

মাণিককে উপরের একটা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নারাণী চুপি চুপি বলিল, একটি গায়েন্ গাও ত', মাণিক!

কথাটা শুনিয়া মাণিকের গাল দুইটা হিঙুলের মত লাল হইয়া উঠিল। নারাণীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, গাইতে লারি যে!

নারাণী বিশ্বাস করিল না, বলিল, হুঃ,—লারো আবার!

মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। মিছে কথা লয়।

নারাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমি শুনেছি। সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে —

মাণিকের চোখে মুখে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, ধেৎ!

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল. উ আমি শুনেছিলম ইষ্টিশনে,—একটা লোক গাইছিল।

নারাণী আবার বলিল, হু, তাই গাও।

মাণিক বলিল, আমি লারি যে,—বল্লম।

মাণিক কিছুতেই গাহিতেছে না দেখিয়া নারাণী আর থাকিতে পারিল না। জোর করিয়া তাহাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিল এবং সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে মাণিকের গালের উপর একটি চুমু দিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানির দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল। তাহার পর চুপি-চুপি বলিল, এবারে গাইবে ত? লক্ষ্মী, মাণিক—

মাণিক কেমন-যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সেখান হইতে চলিয়াও গেল না,—যাইবার চেষ্টাও করিল না, নারাণীর বাহু-বন্ধনের

মধ্যে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দেয়ালের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

নারাণী আবার বলিল, গাও।

গাই। বলিয়া মাণিক এইবার গাহিতে সম্মত হইয়া তাহার কোল ঘেঁসিয়া চুপটি করিয়া বসিল, নারাণীর আরক্ত মুখখানির দিকে একবার তাকাইল, কিন্তু অসহ্য লজ্জায় সেদিক হইতে তাহার কালো চোখ দুইটি তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া লইতে হইল। নারাণীর কানে ছোট্ট পারশী-মাকড়ির ভিতরের তারাটি কাঁপিতেছিল, মাণিক সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া গাহিতে লাগিল। পাছে কেহ শুনিতে পায় ভাবিয়া বেশী জোরে সে গাহিতে পারিল না,—কিন্তু সে কী সুর! মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। নারাণী জীবনে কখনও এমন ছেলেও দেখে নাই, এমন গানও শোনে নাই। একদৃষ্টে সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু ক্রমেই যেন অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল; গান শেষ হইবামাত্র নারাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, হ, হইছে। তুমি যাও ইবারে,—কিন্তুক্ আবার গাইবে ত?

মাণিক ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর মাণিককে আর দেখিতে পাওয়া গেল না,—সে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল। এদিকে তারিণী মুখুয্যের ষষ্ঠ পক্ষও গত হইলেন।

কিন্তু মাণিক হয়ত তাহার দিদির মৃত্যু-সংবাদ জানিত না। বৎসর

খানেক্ পরে সে আবার একদিন আসিয়া হাজির! দিদি নাই শুনিয়া মাণিক পুনরায় ফিরিয়া যাইতেছিল,—নারাণী তাহাকে যাইতে দিল না। বলিল, আজ আর কোথাকে যাবে মাণিক, দুদিন বাদে যেও।

নারাণী তার বাবার কাছে একদিন প্রস্তাব করিল, বাবা, মাণিক ত আমাদেরই কুলিন,—উয়ার সাথে আমাদের গৌরীর বিয়ে দাও না! বেশ ছেলেটি।

কথাটা তারিণী মুখয্যের মাথায় একদিনও ঢুকে নাই, আজ হঠাৎ এই প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার ঠিক মনে ধরিয়া গেল। ঠিক ত! নারাণীর বুদ্ধি আছে। ছেলেটি ভাল, গৌরীর সঙ্গে মানাইবে বেশ, কুলিন, তার উপর টাকা-কড়ির ভাবনা মোটেই ভাবিতে হইবে না। বুড়া বরে দেওয়ার চেয়ে এ-ই ভালো।

মাণিকের পৈতা কে যে কখন্ দয়া করিয়া দিয়াছিল কে জানে, তারিণী মুখুয্যে আর কালবিলম্ব না করিয়া মাণিকের হাতেই তাঁহার গৌরী দান করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু বাঁধন-হারা এই ছেলেটা বিবাহের বন্ধন স্বীকার করিল না। দিন-কতক পরে হঠাৎ একদিন কোথায় উধাও হইয়া গেল।

কিছুদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, গণেশ অধিকারীর যাত্রার দলের ম্যানেজার নাকি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, এবং আমলাজুড়ির মেলায় তাহারা নাকি মাণিককে রাধিকা সাজাইয়া গান গাওয়াইতেছে।

আদরিণী ভাতুরাণী এলো আমার ঘরকে—

আমলাজুড়ি সেখান হইতে ক্রোশ-দুইএর মধ্যে। বুড়া তারিণী মুখুয্যে নিজে গিয়া অনেক কষ্টে মাণিককে আবার ধরিয়া আনিলেন।

তাহার পর থাকে, থাকে,—মাণিক একদিন সকালবেলা ঘর হইতে বাহির হইতেছে,—গৌরী তখন ছোট একটা 'কানাড়ি' পরিয়া তাহারই আঁচলে কতকগুলি মুড়ি লইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া চিবাইতেছিল। মাণিককে দেখিয়া প্রথমে সে দৌড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনদিকে পথ খুঁজিয়া পাইল না,—এক দিকে মাণিক আসিতেছে, অন্যদিকে পথের উপর একপাল গরু। অগত্যা মুড়িগুলি ছড়াইয়া দিয়া সে তাহার পরণের ছোট এক-ফেরতা মোটা কাপড়খানি তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিল, এবং তাই দিয়া কোনরকমে তাহার মাথা ও মুখখানা, ঘোমটা-ঢাকার মত ঢাকিয়া ফেলিয়া, কপাটের আড়ালে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মাণিক মুখে কিছুই বলিল না। পাশেই লাউ-কুমড়ার একটা মাচা বাঁধা ছিল,—সেইখান হইতে তাড়াতাড়ি বাঁশের একটা কঞ্চি তুলিয়া লইয়া লজ্জাবতী এই বধূটির উন্মুক্ত পাদদেশ এবং পৃষ্ঠদেশ উত্তমরূপে চিত্র-বিচিত্রিত করিয়া দিয়া সেই যে চলিয়া গেল,—দিন দশ-পনর আর দেখা নাই।

ভাদ্রমাসের শেষাশেষি নিজে হইতেই মাণিক একদিন ফিরিয়া আসিল।

কয়েক্‌দিন ধরিয়া বাদল নামিয়াছে। অনবরত বৃষ্টি,—কখনও ঝম্ ঝম্ করিয়া নামিতেছে, আবার কখন-বা টিপ্‌টিপ্ করিয়া পড়িতেছে। বৃষ্টির বিরাম নাই।

সেদিন রাত্রে রান্নাঘরের বারান্দার উপর তারিণী মুখুয্যে ও মাণিক খাইতে বসিয়াছিল। হারাণী তাহাদের ভাত ধরিয়া দিয়া অদূরে রান্নাঘরের একটা কপাটের উপর বাঁ-হাতটা রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তারিণী মাণিককে উপদেশ দিতেছিলেন, বড় হঁইছ বাবা, বুদ্ধি-সুদ্ধি হঁইছে,—এখনও-কি এম্‌নি পালাঁই-পালাঁই বেড়ায়?

হাঁ, না, কিছু না বলিয়াই মাণিক আপন-মনে খাইতে লাগিল।

তাহাদের সুমুখে-নামানো লণ্ঠনটার চারিদিকে কয়েক্‌টা বাদল পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পোকাগুলা পাছে ভাতের উপর উড়িয়া আসে এই ভয়ে তারিণী বলিলেন, আঃ, কি জ্বালা! লণ্ঠনটা সরাঁই দিয়ে যা হারাণী, ই-গুলা এখনি যে ভাতেই পড়বেক।

হারাণী ধীরে-ধীরে লণ্ঠনটা একটুখানি দূরে সরাইয়া দিয়া আবার সেই দরজার চৌকাঠের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণী বলিয়া উঠিলেন, ই মাছ কুথা পেলি হারাণী?

হারাণী বলিল, বাগদি-বউ দিয়ে গেইছিল। যে বাদল, মাছের ভাবনা কি?

তারিণী বলিলেন, নাঃ, ই ভাল রাঁধ্‌তে লেরেছিস্ তুঁই। মাছ

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

র'াধ্তো ভুরূ ল-গায়ের-মা, ঠিক যেমন অমিত্তি।—খাস্ নাই?

হারাণী চুপ করিয়া রহিল। ন' বৎসর বয়সে সে বিধবা হইয়াছে,—আর এখন তার বয়স ত্রিশ। ল-গায়ের-বৌ আসিয়াছিল—সে বিধবা হইবার পরে। কাজেই তাহার অমিয-ভক্ষণের কথাটা মনে পড়ুক্ আর না-ই পড়ুক্, পিতার এই অনুচিত প্রশ্নে তাহার নিজের অকাল বৈধব্যের কথাটাই ভাল করিয়া মনে পড়িল।

তারিণী একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, ও! না, না, হারাণ বাবাজী তখন গত হইছে। ওঃ! হায়, হায়, অমন বংশ,—কি কুলিনটাই-না ছিল।

কথাটা শুনিয়া হারাণী দাতে দাত চাপিয়া রাগে গিস্ গিস্ করিতেছিল। মনে-মনেই বলিল, পিণ্ডি ছিল,—তোমার মুণ্ডু ছিল।

এমন সময় উঠানের জল-কাদা হইতে ছোট একটা ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে মাণিকের ভাতের থালার উপরেই আসিয়া পড়িল। মাণিক তাড়াতাড়ি সেটাকে ভাত-চাপা দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

তারিণী বলিয়া উঠিলেন, উঠ্লে যে বাবাজি? ইয়ার-মধ্যেই খাওয়া কি তোমার হয়ে গেল?

হাঁ—বলিয়া মাণিক ঘটির জলে আঁচাইয়া উঠানের উপর নামিয়া অন্ধকারেই সোজা বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

বাহিরে তখনও টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। তারিণী আস্তে

আস্তে বলিলেন, গ্যাখ্ আবার কোথাম্ রাগ্-টাগ্ করে' পালালো নিকি—

হারাণী বলিল, না।

দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তারিণী জবাব দিলেন, না! তর্ কথাতেই না! দেখ্ কেনে? ঢুক্ছেন্ উঠানে নেমেই দেখ্ কেনে?

অন্ধকার জল-ছপ্-ছপে উঠানের উপর হারাণী নামিয়া গেল।

তারিণী তাঁহার আগের কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিলেন, যাবি তখন কুমোর বেঁধে আন্তে তুরা! কুথা রামকানালি, কুথা আমলাজুড়ি,—গেলম্ ত' একবার হুঁটুরতে-পুটুরতে এই জল-বাদলেই ছুটে। কি বিশ্বাস উ ইচড়-পাকা ছেলেকে,—দিবেক্ হয় ত কোই ডিল্লি পর্যান্ত ছুটোই! লে তখন. মর্ শালা তুঁই, বাঁধ্ মড়ি চিড়া—

উঠানটা পার হইয়া গিয়া অন্ধকারে হারাণী আন্দাজি ডাকিল, মাণিক!

মাণিক তখন বৈঠকখানার বারান্দার উপর উঠিয়া গিয়াছিল, সেইখান হইতেই সাড়া দিল,—কি!

হারাণী কি বলিবে কিছুই খুঁজিয়া পাইল না; বলিল, পান লিলে নাই?

অন্ধকারেই জবাব আসিল. পান যে আমি খাই না—

ওইখানেই থাক্বে ত'?

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

হাঁ।

হারাণী আর-কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল। বলিল, লারাণী-টারাণী সব বৈঠক্‌খানার উপরে ভাদু * করছে, সেই খান্‌কেই গেল।

কথাটা শুনিয়া তারিণী আশ্বস্ত হইলেন। বলিলেন, তা হবেক্। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আম্‌লাজুড়ির মেলায় যখন গেলম্, দেখি, মেয়্যাঁলোক সেজে উ গায়েন্ করছে—আমি ত পিথমে চিন্‌তেই লারলম। তা-বাদে, বলি, হঁ, উ-ই বেটে, আর কেউ লয়। তা এমন গায়েন্, সবাইকে কাঁদাই দিয়েছিল বাবা—

হারাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাদল-বাতাসে ভাদুর গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

---

* মানভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার অধিকাংশ স্থানে ভাদ্রমাসে 'ভাদু' পূজা হয়। এ পূজা মেয়েদের। কুমারী এবং বিবাহিতা তরুণীরাই সাধারণতঃ ভাদু পূজা করিয়া থাকে। মাটির একটি রমণী-মূর্ত্তি গড়িয়া রং দিয়া উজ্জ্বলরূপে সাজাইয়া ভাদ্রমাসের প্রথমদিনেই মেয়েরা সেটিকে ঘরে আনে। তাহার পর সমস্ত ভাদ্রমাস ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায়, সকলে মিলিয়া তাহার সুমুখে বসিয়া সুর করিয়া গান গায়। ভাদ্রের সংক্রান্তির দিনে পূজার শেষ। সেদিন তাহাদের জাগরণ-উৎসব। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মেয়েরা গান গায়, হাসি-ঠাট্টা আমোদ-আহ্লাদ করে এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে নিজেরাই গান গাহিতে গাহিতে প্রতিমাটিকে পুষ্করিণী কিংবা নদীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া স্নান করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই ভাদু কর্‌তে যাস্ নাই?

না। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হারাণী রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

কেন যাইতে পায় না সে? কেনই-বা যায় না...

হিন্দুর কোনও আনন্দ-উৎসবই যে বিধবার জন্য নয়।

হারাণীর সর্ব্বাঙ্গ রি রি করিতে লাগিল। মনে হইল, তাহার এই ব্যর্থ বঞ্চিত জীবনের জন্য তাহার এই বৃদ্ধ পিতাই সব চেয়ে বেশী দায়ি! অথচ, এই সেদিন পর্য্যন্ত তাহারই চোখের সুমুখে একটার পর একটা বৌ তিনি ঘরে আনিয়াছেন; হারাণী নিজের হাতে তাহাদের বিলাস-শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছে। তিনি তাহাতে এতটুকু লজ্জিত হন নাই!

তাহার পর,—নারী যেমন করিয়া মরে, তেম্‌নি করিয়া মরিয়াছে তিন জন, গোপনে আত্মহত্যা করিয়াছে তিন জন, আর একজন কুলে কালি দিয়াছে!

কিন্তু উপবাসী শুধু সে নিজে বাঁচিয়া রহিল, অনন্ত এই ভোগ-নরকের দাসীবৃত্তি করিবার জন্য! এত নিষ্ঠুর বিধান যদি হয় বিধির,—তবে সেই বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তুমিই ঠিক করিয়াছ কলঙ্কিনী মা আমার...

তীব্র দাহনের জ্বালায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিতে লাগিল।

*　　　*　　　*　　　*

আদরিণী ভাতুরাণী এলো আমার ঘরকে---

মাণিক সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া দেখিল, ভাতুর সুমুখে মেঝের উপর একটা সৎরঞ্চ বিছাইয়া মেয়েরা বসিয়া বসিয়া গান করিতেছে। নারাণী, গৌরী ত আছেই, তাহা ছাড়া, পাড়ার ছোট, বড়, মাঝারি, আরও অনেক মেয়ে সেখানে জড় হইয়াছে।

রাস্তার ও-পারে সামনা-সামনি মজুমদারদের বাড়ী। তাহাদের মেয়েরাও ভাতু আনিয়াছে। আগুনের শিখার মত নারাণীর এই রূপের ঝাঁঝে অনেকেই পুড়িয়া মরিত,—পুরুষেরা লোভে, মেয়েরা ঈর্ষায়। নারাণী ভাতু আনিয়াছে দেখিয়া এবেল মজুমদারের বড় মেয়ে চারীও ভাতু আনিল।

ভাতু গাহিতে গাহিতে দুই দলে পাল্লা লাগিয়া গেল। সেখান হইতে সমস্তই শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। মাণিক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

মজুমদারদের চারীর দল গাহিতেছিল,—

বান এলো, বরষা এলো, ভেসে এলো পদ্ম পাতা,
তোদের ভাতু আয়লো নিয়ে (আমার) ভাতুর সঙ্গে সই পাতা।

নারাণী ছাড়িবার মেয়ে নয়। সে গাহিল,—

আমার ভাতু যাবেক্ কেনে লো, আমার ভাতু রাজরাণী--
তোদের ভাতু আসবেক্ হেথা, সে যে ভাতুর চাকরাণী।

তাহারা জবাব দিল,—

টিপ্ দিব, টায়রা দিব, সোণার চিরুণ্ বাঁধার,

আমার ভাদুর সাজ দেখায়ে পাড়ার ভাদু কাঁদাব।

ওলো শুনে যা লো—

নারাণীর দল বলিল,—

মাথায় দিব হীরের মুকুট, বুকে দিব কাঁচুলি—

তোদের ভাদু কেঁদে কেঁদে বেড়াবেক্ কুলি কুলি।

তোরা দেখ্‌বি লো চেয়ে।

মজুমদারদের মেয়েরা পাল্টা গাহিল,—

ঘোড়া দিব, পাল্‌কি দিব, পথে কাদা জমেছে,

তখন তোরা দেখ্‌বি চেয়ে তোদের গরব কমেছে।

এত গরব করিস্ না লো,—এত গরব করিস না।

নারাণী গাহিল,—

ঘোড়া পাল্‌কি কোথা পাবি লো, এত গুমর সাজ্‌বে না,

দিবি পায়ে দু'গাছি মল (তাও আবার) জলে কাদায়

বাজ্‌বে না।

এ-গুমরে মরিস্ না লো,—এই গুমরে মরিস্ না!

এমন সময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। মজুমদারদের টিনের চালায় যেন ঘোড়-দৌড় হইতে লাগিল। কে কার কথা শোনে...

জান্‌লার কাছে নাকে নোলক-পরা ফুট্‌-ফুটে যে-মেয়েটি বসিয়াছিল, একগাল হাসিয়া সে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, হেই—যা! লে ইবারে। গা, কে গাইবি।

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

বা! জল এলো! বলিয়া একটি ছোট মেয়ে জানালার পথে উঁকি মারিয়া দূরে তাহাদের ঘরের দিকে একবার তাকাইল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ভাল দেখা গেল না।

সিঁড়ির উপরে মাণিককে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরের মধ্যে কে-একজন বলিয়া উঠিল, হা-স্থাখ্ মাণিক।

আর যায় কোথা! কয়েকজন তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের আসরের মধ্যে টানিয়া আনিল। কিন্তু শুধু টানিয়া আনিয়াই কি রক্ষা আছে, হয় তাহাকে গান গাহিতে হইবে, নয় ত এই দুরন্ত-চপল বালিকা ও যুবতীদের হাতে তাহার আর নিস্তার নাই, টানা-হেঁচ্ড়া করিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া খাইবে! গৌরী দেওয়াল-ঘেঁসিয়া কয়েকটা মেয়ের আড়ালে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া ফিক্-ফিক্ করিয়া হাসিতেছিল। দুইটা বার-তের বছরের মেয়ে, মাণিককে অতর্কিতে তাহার গায়ের উপর ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল; একবার ঠেলিয়াও দিল। মাণিক অনেক কষ্টে পড়ি-পড়ি করিয়া সামলাইয়া লইল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সামলাইতে পারিল না,—ঠেলা খাইয়া সে একেবারে গৌরীর গায়ের উপরেই গিয়া পড়িল।

নারাণী এতক্ষণ কিছুই বলে নাই। এইবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে-ধীরে উঠিয়া আসিয়া ছোট মেয়েগুলাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিয়া উঠিল, আ-মর্! কি হচ্ছে কি লো

ফাজিল্ ছুঁড়িরা! তোদের বিয়ে হলে তোরা আব কিছু বাকি রাখ্‌বি নাই দেখ্‌ছি—

এই অবসরে মাণিক তাহাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। নারাণীও তাহার পশ্চাতে সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া গেল।

বৃষ্টি তখনও ধরে নাই। মাণিক বৈঠকখানার চালায় গিয়া অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

নারাণী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আমার কাছে বসবে এসো. উ ফাজিল দুষ্টু মেয়েগুলা অম্‌নি বেটে।

না, যাই। আমার ঘুম লেগেছে। বলিয়া মাণিক মখ ফিরাইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নারাণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, না, জলে ভিজে ভিজে যেতে হবেক নাই। জল থামুক্, ততক্ষণ আমার কাছকে চল, আমার কোলে মাথা দিয়ে ঘুমোবে গা। লয়?

মাণিক কিছুতেই যাইতে চাহিতেছিল না। নারাণী তাহার হাত ধরিয়া কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অগ্নি-গর্ভ ভয়ানক একটা বিদ্যুতের রেখা সুমুখের অন্ধকার আকাশটাকে একবার ছিন্ন-ভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া দিয়াই নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মাণিক চোখ বুজিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কোলের কাছে সরিয়া আসিল। নারাণী সম্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি হলো?

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

মাণিক ঈষৎ হাসিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, ভয় লাগে।

কেনে?

ওইগুলাকে। বলিয়া অন্ধকারেই মাণিক তাহার বাঁ-হাতটি আকাশের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

ও, ভয় কি? বলিয়া ভীত সন্ত্রস্ত মাণিককে সে তাহার নিরাপদ অঞ্চল আড়ালে টানিয়া আনিয়া নিমেষেই যেন সে তাহাকে সমস্ত ভয়-ভাবনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া সস্নেহে চাপিয়া ধরিল।

চোখের সুমুখে আর-একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। মাণিক এবার ভয় পাইল কি-না কে জানে, কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে যে তাহার অঞ্চল আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে তাহার শুভ্র সুকুমার মুখখানি সেই তিব্রোজ্জ্বল আলোক-শিখায় ক্ষণিকের তরে নারাণীর চোখের উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেই, কি-এক অননুভূত আনন্দ-বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাণিকের হিম-শীতল একটি গালের উপর নিজের ঠাণ্ডা গালটি চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার, চল, একটি গায়েন্ করবে।—লয়? একটি, একটি গায়েন্—তা-বাদে ঘুমোবে।

সহসা কে যেন তাহাদের পশ্চাতে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আচম্‌কা এই শব্দ শুনিয়া মাণিক চমকিয়া উঠিল। নারাণী ভাল করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া পিছন ফিরিতেই দেখিল, মজুমদারদের বাড়ীর ছটা মেয়ে, হাতে লণ্ঠন, মাথায় ছাতি।

নারাণী জিজ্ঞাসা করিল, কি লো? ভুরা যে?

একটা মেয়ে বলিল, কেনে? আস্‌তে নাই লিকিন্‌?

আর-একজন হাসিতে হাসিতে বলিল, না লো, চারু পাঠালেক। শুদোলেক, গায়েন্‌ ভুরা বন্ধ কর্‌লি কেনে—

নারাণী বলিল, বল্‌-গা, বন্ধ করি নাই, আবার গাইব।

কিন্তুক গাল দিস্‌ না নারাণী, কাকা রইছে উ-ঘরে শুয়ে।

নারাণী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আর-একটা মেয়ে বলিয়া উঠিল, ভুর্‌ গায়েন্‌ করবার লোকের ভাবনা কি নারাণী, এই যে রইছে, বা, বেশ সেজেছে দু-জনকে। এই বলিয়া সে মাণিককে দেখাইয়া ফিক্‌-ফিক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। মাণিককে তখনও সে তেমনি ভাবে ধরিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল।

চল্‌ তবে ভুর ভাত্ন দেখেই যাই। বলিয়া মেয়ে দুটো, উপরে উঠিতে লাগিল।

আয়। বলিয়া মাণিককে লইয়া নারাণী আগেই উঠিয়া গেল।

পরদিন জাগরণ-উৎসব।

মেয়েরা আজ সারারাত ধরিয়া নাচিবে, গাহিবে, ফুর্ত্তি করিবে। সারাটা দিন আজ তাহাদের সাজ-সজ্জার আয়োজনেই কাটিল।

নিজেদের অলঙ্কার খুলিয়া ভাদুকে পরাইল, মাথায় দিল ঝাপ্টা টায়রা, কপালে দিল টিপ, নাকে নোলক্ আর গলায় দিল হরগৌরী আর সন্ধ্যামণির মালা, পায়ের উপর রক্তপদ্ম। দুই পার্শ্বে মৃণালের ডগায় আধফুটন্ত পদ্মের গুচ্ছ বাদল-বাতাসে দুলিতে লাগিল। দেওদারের কোঁকড়ানো পাতা আর কাশের গুচ্ছে চারিটা দেওয়াল ভরিয়া গেল। মাথার উপর সরু সরু সূতায়-জড়ানো কচি তরু-লতার সবুজ চন্দ্রাতপ! তারিণী মুখুয্যের বহু পুরাতন বৈঠকখানাটি আজ রূপসীদের হাতে পড়িয়া বিনা-কড়ির ফুলে-পাতায় সে-এক নূতন রূপে ঝল্ মল্ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইতে আপন-আপন নৈবেদ্য থালায় সাজাইয়া মেয়েরা একে-একে জড় হইতেছিল।

সেদিন শনিবার। কয়লা-কুঠি হইতে রঞ্জন আসিবে তাই তাহার খাবার রাখিয়া দিয়া হারাণী আজ সকাল সকাল অন্যান্য সকলকে খাওয়াইয়া দিল। তারিণী মুখুয্যের শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না, সামান্য দুধ খাইয়া সন্ধ্যারাত্রেই তিনি শয়ন করিলেন।

ঘরের চালায় হারাণী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, নারাণী বলিল, চল্ দিদি একবার দেখে আয়গা কেমন সাজাইছি।

হারাণী বলিল, না লো না। উ আর আমাকে দেখতে হবেক নাই, তুরাই যা। রঞ্জন আসবেক আখুনি, খেতে দিতে হবেক।

নারাণী কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, আমি উসব মানি না দিদি, তুই চল্, তা না হলে আমার মনটা কেমন করছে।

হারাণী একবার গেল বটে, কিন্তু শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অমান্ত করিলে চলে না, কাজেই তৎক্ষণাৎ সে ফিরিয়া আসিল।

ফিরিবার পথে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় হারাণীর মুখের চেহারা অত্যন্ত ম্লান দেখাইতেছিল। এত ম্লান যে সেদিকে তাকানো যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য, হিন্দুশাস্ত্রকারগণকে ডাকিয়া ইহা দেখানো চলে না।

রঞ্জন যখন আসিল, নারাণীদের আনন্দ-উৎসব তখন পুরাদমেই চলিতেছে। ঘরের চৌকাঠে মাথা রাখিয়া হারাণী একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, রঞ্জনের দুর্ব্বল পায়ের ভারি বুটের শব্দে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

পায়ের জুতা মোজা এবং গায়ের জিনের কোট খুলিতে খুলিতে রঞ্জন বলিল, উয়ারা কি ভাদু করতে গেইছে নাকি?

হাঁ, তুমি এখন খাবে? ভাত বেড়ে রেখেছি। বলিয়া হারাণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

শুঁই শুঁই করিয়া রঞ্জন কি যে বলিল, কিছুই বুঝা গেল না।

হারাণী ভাত বাড়িয়া দিয়া তাহাকে ডাকিল। খাইতে বসিয়া রঞ্জন বলিল, ই ত ভেলে জ্বালায় পড়লম মাইরি!

হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, কেনে? কি হলো?

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরেক—

রঞ্জন বেশ জোরে-জোরেই বলিল, কেনে, উ জানে না আমি আসব আজ ?

'উ' কথাটা যে কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইতেছে, হারাণী তাহা বুঝিল। বলিল, জানে বই কি।

তবে ?

তবে কি ?

তবে যে গেঁইছে ?

কোথা ?

রঞ্জন এইবার বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, ভত লারিনা তোমার সঙ্গে বক্‌তে। চোঁদড়্-কলা করছ কেনে ? বলিয়াই হারাণীর দিকে মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল।

রঞ্জনের রঞ্জিত দুইটি চক্ষু দেখিয়াই হারাণীর আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সে আজ বেশ ভাল করিয়াই ধেনো-মদ গিলিয়া আসিয়াছে। তাই সে আর বেশী-কিছু উচ্চ-বাচ্য না করিয়া তাহার হাতের কাছে পান, জল, ইত্যাদি ধরিয়া দিয়া মানে-মানে সেখান হইতে পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, রঞ্জন অনুনয়ের সুরে বলিল, আমাদের উয়াকে তুমি একবার ডেকে দাও মাইরি —

আমি লারব। গরজ থাকে ত' নিজেই যেতে পার। বলিয়া হারাণী অতিসত্বর সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং তাড়াতাড়ি একটা ঘরের ভিতর খিল বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

আহারাদির পর, টলিতে টলিতে রঞ্জন নিজেই গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সরাসর তাহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না, অই অতগুলা মেয়ের গাদা হইতে নারাণীকে সে যে কেমন করিয়া তুলিয়া আনিবে, সিঁড়ির একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

নারাণীরা তখন মজুমদারদের মেয়েদের সঙ্গে আবার পাল্লা লাগাইয়াছে।

নারাণী প্রথমে কি বলিয়াছিল কে জানে। তাহারা গাহিতেছিল,—

এত গরব কিসকে লো তোর পাকা ডেমুর খাস্ নাই !
আ-ম'লো যা ঘর-জামায়ী ! ঘর ছেড়ে ত' যাস্ নাই।
কয়লা-খাদের ময়লা বাবু, কোনো সুখ ত' পাস্ নাই !

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে রঞ্জনের বিকৃত মস্তিষ্কেও তাহা প্রবেশ করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। একে ত' রাগিয়াই ছিল, তাহার উপর সে কিনা কয়লা-খাদের ময়লাবাবু! নিমেষেই সে যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জ্বলন্ত বিড়িটা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া রঞ্জন একেবারে হুড়্মুড়্ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, উঠ্ উঠ্ সব এখান থেকে উঠ,—চুয়াড়ি আরম্ভ করেছে সব এইখানে বেহায়া মাগীরা! তুর ভাতুর কিছু বলে নাই! দিব এখুনি গঁড়ারে ভাতুর নাক্‌কে উড়োঁই!

আদরিণী ভাতুরাণী এলো আমার ঘরকে—

এই বলিয়া আস্ফালন করিয়া সে খানিকটা অগ্রসর হইতে গেল, কিন্তু এতগুলা মেয়ের মধ্যে দিয়া ভাতুর কাছে পৌছানো বড় সোজা কথা নয়। রঞ্জনের মত লোককে, বিশেষত আজিকার এই উৎসবের রাত্রে মেয়েরা 'থোড়াই কেয়ার্' করে। বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে রঞ্জনের নাকের গোড়ায় হাতটা নাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ওঃহ তুঁই যা ত' ইখান্ থেকে! ভুখে কেউ সাউকারী মারাতে ডাকে নাই।

আর-একজন কি একটা অভদ্র বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া দিল, আঃ, কি রূপে-গুণে কার্ত্তিক এলেন হে আমার! পুরুষের রাগ দেখ্‌লে কি হয়!

তের-চোদ্দ বছরের মেয়ের যে-দলটা ছিল, ধানী-লঙ্কার মত ছোট হইলেও তেজ যেন তাহাদেরই সব-চেয়ে বেশী,—মুখে দিতে-না-দিতেই চোখে জল আসিয়া পড়ে।

তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, আসুন জামাই-বাবু, মাথায় ফুলং তেল দিয়ে দি,—মাথা ঠাণ্ডা হোক্।

আর একজন বলিল, না, না, আসুন, আজ্ঞে, গায়েন্ করুন্।

একজন বলিল, আসুন মশাই, বসুন খাটে।

আর-একজন বলিল, পা ধোন্ গে গ'ড়ের ঘাটে।

একজন তাহার কাছার কাপড়টা টানিয়া দিয়া বলিল, না, না, ছি! করছিস কি?

আর একজন বলিল, না, না, এই যে, বস্‌তে দি।

আর একজন বলিয়া উঠিল, এসো, আঁচল পেতেছি।—

তবে এই ঠেলে' দিয়েছি। বলিয়া একটা মেয়ে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। মুখে আর কেহ কিছুই বলিল না। যদি-বা বলিল, গোলমালে আর কিছুই শোনা গেল না। সকলে মিলিয়া একটু একটু করিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে রঞ্জনকে একবারে সিঁড়ির কাছে লইয়া আসিল।

তবে এড়াস্। বলিয়া একটি মেয়ে তাহাকে শেষ ঠেলা ঠেলিয়া দিতেই রঞ্জন একেবারে ডিগবাজি খাইয়া দু-তিনটা সিঁড়ির ধাপের নীচে গিয়া পড়িল। বলিল, এই চল্লম আমি তারিণী মুখুয্যের কাছকে। বলি ঘরট ত' তোমার দিলেক্ ভেঙে, তার উপর আবার বাউরীচুয়াড়ি—

পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটি মেয়ে নারাণীকে বলিল, ও বন্! যা তুই, দেখ্, আবার, সত্যিই যাবেক্ হয়ত চলে'—

নারাণী উঠিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকও উঠিল। বলিল, আমিও চল্‌লম ইখান থেকে।

পথে ছোট মেয়েগুলা তাহাকে আট্‌কাইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

নারাণীকে দেখিয়াই রঞ্জন তাহার একখানা হাত ধরিয়া চড় চড় করিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে বলিল, চল্, ইখানে থাক্‌তে পারি নাই।

আদরিণী ভাতুরাণী এলো আমার ঘরকে—

ও মা! ই কুপাকার বেহায়া গো,—ছাড় হাত, হাত ছাড়ো। বলিয়া নারাণী একটা হেঁচ্‌কা টান দিয়া হাতটা তাহার ছাড়াইয়া লইল।

রঞ্জন জোরে জোরে বলিয়া উঠিল, বেটে? তবে বইবি এইখানে? ঐ আঁটকুড়ির-বিটিদের সঙ্গে বসে' বসে' সারারাত মুখ খিস্তি করবি?

হঁ, করব। যাও তুমি। বলিয়া নারাণী তাহার হাত ধরিয়া চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল।

ছোট মেয়েগুলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মাণিক এতক্ষণে নীচে নামিয়া আসিল। নারাণীর উপর রঞ্জনের নিষ্ফল আক্রোশটা গিয়া পড়িল এইবার এই ছেলেটার উপর।

রঞ্জন হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল, এই ছোঁড়া, শোন্।

মাণিক ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, ইচড়্‌-পাকা ছেলে কোথাকার! গেলি যে জহন্নামে! দিনরাত মেয়েদের সঙ্গে হাসি, গান, গল্প—এঃ শূয়ার! বলিয়াই ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড়্ মারিয়া দিয়া বলিল, বেরো ইখান্ থেকে!

কোনদিন কাহারও কাছে মাণিক মার খায় নাই। আজ এই অপ্রত্যাশিত তিরস্কারে নিদারুণ অভিমান ও লজ্জায় সেখান হইতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

নারাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, মুখ দিয়া এতক্ষণ একটি কথাও তাহার বাহির হয় নাই, এইবার মাণিক চলিয়া গেলে সে রঞ্জনের কাছে আগাইয়া আসিয়া বলিল, গলায় তোমার দড়ি জোটে না এক-খি? মদ-মাতালি হলো না কি? ইয়াকে কি বলে?—আর-কিছু সে বলিতে পারিল না, অসহ্য দুঃখে মুখের কথা তাহার বুকেই আটকাইয়া রহিল।

অম্‌নি দিব যেদিন তুকেও ধুম্‌সো-পেটা করে, বুঝবি সেইদিন! বলিতে বলিতে রঞ্জন সেখান হইতে চলিয়া গেল।

নারাণী উপরে উঠিয়া যাইতেই মেয়েরা বলিয়া উঠিল, দিয়ে এলি?

নারাণী কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিল। তাহার পর হঠাৎ এক সময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, দে, দে গান উয়াদিকে। লাগা—উয়াদের জবাব দিবি নাই? বলিয়াই সকলের সহিত সুর করিয়া নারাণী গাহিতে লাগিল,—

কাঁচা ডেমুর তুরা খাগা, পাকা ডেমুর খেঁয়েছি,
কয়লা-খাদের ময়লা গাদায় মাণিক কুড়োঁই পেঁয়েছি।

মজুমদারদের মেয়েরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়া বসিল,—

ও নারাণী! ও নারাণী! ভাঙ্‌ছি লো তোর মাণিক পাওয়া!
নিজের চোখে এলম্‌ দেখে'
ভগিন্‌পো'ত ওই ছোঁড়াটাকে

আদরিণী ভাদুরাণী এলো আমার ঘরকে—

কোলের উপর ঘুম পাড়ালি আঁচল দিযে করলি হাওয়া।

রটাই দিব দেশ-বিদেশে ভগ্নিপতির চুমো খাওয়া!

এমনি করিয়া সারারাত ধরিয়া তাহাদের জবাবের পর জবাব চলিল। নারাণী একটি বারের জন্যও ক্লান্ত হইল না। সমস্ত রাত্রি মেঘের পর্দায় চাঁদের আলো ঢাকা পড়িয়া কেমন যেন ঘোলাটে জ্যোৎস্নার কুহেলিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভোরের বেলা বাদল নামিল। এইবার নারাণী মনে-মনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। মাণিক চলিয়া গেছে। অভিমান করিয়া কোথায় যে গেল তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই। এক একবার ভয় হইতেছিল, সত্যই সে আবার কোথাও উধাও হইবে না ত! আবার মনে হইল, না, যাইবে না সে। তাহাকে ছাড়িয়া সে আর যাইতে পারে না! কিন্তু ভয়টাকেও মন হইতে সে সম্পূর্ণ দূর করিতে পারিল না, আশঙ্কান্দোলিত হৃদয়ে নারাণী নীচে নামিয়া আসিল,—চারিদিকে বাদল নামিয়াছে! যাইবার উপায় নাই…

বৃষ্টি ধরিল। ভাদু লইয়া মেয়েরা গাহিতে গাহিতে পুকুরের দিকে চলিল। নারাণীও সঙ্গে গেল। উৎসবের অবসাদ তাহার পা-দুটাকে বারে-বারে যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল। উদগ্রীব ব্যাকুল চক্ষু দুইটি বারে-বারে সবুজ কচি ধানের ক্ষেতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া কাহাকে যেন সে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। মাণিকের

প্রণয়-গাওয়া সেই গানখানি মনে পড়িতেছিল,—হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, —সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে !

বাড়ী ফিরিবার জন্য মেয়েরা স্নান করিয়া একে একে প্রস্তুত হইতেছিল। নারাণী স্নান করিল। পূর্ব্ব দিক্-চক্রবালের আরক্ত আকাশের পানে তাকাইয়া কামনা করিল, অভিমান করিয়া যে চলিয়া গেছে, সে যেন তার ছেলে হইয়া কোলে ফিরিয়া আসে। ভাদুর কাছে মনে-মনে বলিল, আসছে বছর যদি আমার ছেলে হয়, ছেলে-কোলে-দেওয়া ভাদু আন্‌ব আমি !

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, মাণিক বিরস মুখে ঘরের চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছে !

নারাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া সস্নেহে তাহার হাতে ধরিয়া কি যে বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শুধু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ক্ষিদে লাগে নাই তোমার ?

এত প্রত্যূষে মানুষের ক্ষুধা পাওয়া উচিতও নয়। মাণিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

নারাণী আর-একবার তাহার সেই কাজল-আঁখি-দুটির পানে তাকাইল, চক্ষু ফিরাইতেও ইচ্ছা করিল না, অথচ, বাহিরে কাজও আছে।